অবধূত ঃ বেআব্রু লেখক?

ড. কালীচরণ দাস - প্রবীর আচার্য

... তার সেই ছোট্ট শরীরখানির বাঁধুনি ছিল অটুট, সব খাঁজ খোঁজগুলি তীক্ষ্ণ সুস্পষ্ট। পিছন ফিরে চলে গেলে ষাট বছরের তত্ত্বদর্শী মশাই থেকে তেরো বছরের ফচ্‌কে ছোঁড়া নাপিতদের নুলো পর্যন্ত সবাই একবার বোষ্টমীর কোমরের নিচে চোখ বুলিয়ে না নিয়ে স্থির থাকতে পারত না।... কী দুঃসাহসিক বেআব্রু বর্ণনা লেখকের! লেখক ওই ক'টি বাক্যের ব্যবহারে উদ্ধারণপুরের ঘাট উপন্যাসে নিতাই বোষ্টমির রূপের বর্ণনা দিচ্ছেন।

অন্য এক জায়গায়— মুয়ে আগুন মাগীর, আজ সকালে শাঁখা সিঁদুর খোয়ালি, আর রাতটা পোহাতে তর সইল না তোর, এর মধ্যে নুড়ো জ্বেলে দিলি নিজের মুখে!

উদ্ধৃতিটি আসলে ধিক্কারোক্তি। আহোরাত্রও পেরোয়নি, তার মধ্যেই সদ্য বিধবা বৌটি পর-পুরুষকে সঙ্গ দান করছে। ধিক্কার তো দিতেই হয়। তবে কাকে? লেখককে না লেখকের তৈরি চরিত্রকে, নাকি লেখকের বেআব্রু ভাষাকে? ধিক্কারসূচক কথাকটি চরিত্রের প্রতি লেখকের আর লেখককে ধিক্কার সমালোচকের। লেখককে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছেন নাম-করা বহু সমালোচক। ঠিক কাজই করেছেন। তাঁদের ক্ষুরধার কলমের খোঁচা— ...আজকাল নিজস্ব অভিজ্ঞতা তা বিকারোন্মত্ত কল্পনার সত্য মিথ্য অতিরঞ্জিত বিবরণ দিয়ে একধরনের রচনা, যা খানিকটা ভ্রমণ কাহিনী খানিকটা নিষিদ্ধ জিনিসের বেআব্রু বর্ণনা খানিকটা বা ছদ্মবেশী বৈরাগ্যকে অবলম্বন করে এক শ্রেণীর পাঠকের করতালি লাভের চেষ্টা করছে। এসব অবধৌতিক প্রক্রিয়ায় বাহবা পাওনা হলেও, এখন তার রঙ্গ মঞ্চে দীপমালা নিভে আসছে।[১] বোঝা যাচ্ছে, সমালোচক আশ্বস্ত হয়েছেন এই ভেবে যে লেখকের আসল পরিচয়টি পাঠকেরা ইত্যবসরে জেনে গেছেন, কাজেই তাঁরা আর অবধৌতিক চমকে মোটেই বিশ্বাস করছেন না। বঙ্গ-সাহিত্যলোকও কলুষিত হচ্ছে না। কেন-না সমালোচকের দৃষ্টিতে লেখকের জনপ্রিয়তা নিম্নগামী।

সমালোচক লেখকের বীভৎস রসকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। বলা বাহুল্য সংস্কৃত সাহিত্যে দশটি রসের অন্যতম হল বীভৎস রস। অভিধান অনুসারে— অলংকার শাস্ত্রে ইহা নীলবর্ণ ও মহাকালদৈব বলিয়া কথিত। এবং এই রস নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি হল দুরূহ ব্যাপার। রাজশেখর বসু যথার্থই বলেছেন—অলঙ্কার শাস্ত্রে যে নবরসের উল্লেখ আছে তার মধ্যে ভয়ানক ও বীভৎস রস, লেখকেরা যথাসাধ্য পরিহার করে থাকেন। আপনার নূতন গ্রন্থে এই দুই রসই প্রধান অবলম্বন এবং তাই দিয়েই আপনি পাঠককে সম্মোহিত করেছেন, শেষ পর্যন্ত কোন আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখেননি।

দীপ্রকলমের পক্ষ থেকে এক সাক্ষাৎকারে স্বর্গীয় নারায়ণ সান্যালকে প্রশ্ন করা হয়েছিল— অবধূত ছাড়া বাংলা সাহিত্যে অন্য কেউ বীভৎস রস নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন না কেন? প্রত্যুত্তরে তিনি বলেছিলেন—তা অবশ্য একাদিক দিয়ে সত্যিই। অবধূত ছাড়া বাংলা সাহিত্যে উচ্চাঙ্গের বীভৎস রস সৃষ্টি আর কেউ করেছেন বলে আমার জানা নেই। তবে আজকালের সাহিত্যে যৌনরস নিয়ে যা সৃষ্টি হচ্ছে তা কি বীভৎস প্রয়োগ নয়? তাই মনে হয় বীভৎস শব্দের একটা বিবর্তন ঘটে গেছে ইতিমধ্যেই।

আবার— সড়ক থেকে নেমে শ্মশানে ঢুকলে দেখা যাবে গঙ্গার জল পর্যন্ত সমস্ত স্থানটুকুময় ভাঙা হাঁড়ি কলসী, পোড়া কাট, বাঁশ চাটাই, মাদুর দড়ি আর হাড়-গোড় পড়ে আছে। ইয়া হামদা হামদা শিয়ালগুলো আধপোড়া মরা নিয়ে টানা হেঁচড়া করছে। দিনের আলোয় সকলের চোখের উপরেই তাদের খেয়োখেয়ির বিরাম নেই। ওদের চক্ষুলজ্জা বলতে কোনও কিছুর বালাই নেই একেবারে। রক্ত চক্ষু কেঁদো কেঁদো কুকুরগুলো বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভারিক্কী চালের মুরব্বী সব, ছোট দিকে নজর যায় না।

...শ্মশানের একেবারে দক্ষিণ সীমায় একটা নেভানো চিতার রাশিকৃত পোড়া কাঠ কয়লার উপর উলঙ্গ এক মূর্তি বসে আছে। একখানা মরার হাড়, বোধহয় কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত, তার মাঝমাঝি কামড়ে ধরে আছে, মুখের দু'ধারে বেরিয়ে আছে হাড় খানা। আর দুটো আধ-খাওয়া মরার মাথা ধরে আছে দু'হাত দিয়ে বুকের কাছে। লোকটি শিবনেত্র, যেন এতটুকু বাহ্যজ্ঞান নেই তার।

শ্মশানের ওই বীভৎস বর্ণনাগুলি কিন্তু আরেক সমালোচকের মনে লেগে গেল। তিনি লিখলেন— ...ধর্মসাধনায় গুহ্য রহস্য ও বীভৎস মানস প্রেরণার গভীরে অবধূতই সর্বাধিক সাফল্যের সাহিত্য অনুপ্রবেশ করিয়াছেন। উৎকট তান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়, মৃত্যু সম্মুখীন মানবের উদাস বৈরাগ্য ও বেপরোয়া মনোবৃত্তি তাঁহার রচনায় সার্থক আবেগ বিহ্বলতা ও ব্যঞ্জনা শক্তির সহিত বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার উদ্ধারণপুরের ঘাট উপন্যাসটি এই সমস্ত গুণের জন্য তাঁহার রচনা তালিকার শীর্ষ স্থানের অধিকারী।... উদ্ধারণপুরের ঘাট হল শ্মশানের মহাকাব্য।[২] মরুতীর্থ হিংলাজ গ্রন্থটি পড়ে দুঁদে সম্পাদক সজনীকান্ত দাস এতটাই উৎফুল্ল হলেন যে উদ্ধারণপুরের ঘাটের পুরো ভূমিকাটাই স্বয়ং লিখে দিলেন।[২(ক)]

কার্যত দেখা যায় ভারতচন্দ্র রায় গুণাকারের অন্নদামঙ্গলের পরে বাংলা সাহিত্যে শ্মশান নিয়ে সহিত্য সৃষ্টি বড়ো একটা কেউ করেননি। কাজেই সমালোচকের এই বক্তব্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লেখক অবধূতের আরেক সৃষ্টি হল মরুতীর্থ হিংলাজ। সে সম্পর্কে খ্যাতনামা পন্ডিত শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তো গদগদ। নির্দেশ দিলেন— প্রতিটি বাঙালিরই মরুতীর্থ হিংলাজ বইটি পড়া উচিত। আবার উদ্ধারপুরের ঘাট সম্পর্কে — অদ্ভুত বই আপনি লিখেছেন।... মরার গদী আর তার সমস্ত বাতাবরণের মধ্য থেকে নিতাই বোষ্টমীর কথাটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।... সার্থক আপনার দৃষ্টি শক্তি, আরও সার্থক আপনার রস সৃষ্টি। অথচ বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পঞ্চাশটি উপন্যাসের তালিকায় এ-হেন সাহিত্যিকের কোনও বই-ই স্থান পায়নি। না উদ্ধারণপুরের ঘাট, না মরুতীর্থ হিংলাজ। নিন্দুকেরা বলেন, বিশেষ কোনও পত্রিকাগোষ্ঠীর সঙ্গে লেখকের মনোমালিন্যের কারণে এই অঘটন। হতেও পারে। কেন-না সেরকমের অঘটন আজও ঘটে এবং ঘটে চলেছে গুচ্ছে গুচ্ছে।

আর তার জেরেই বোধহয় তাঁর জন্ম-শতবার্ষিকীতে বাংলা সাহিত্য-জগত প্রায় নীরব। কেবল ২৩ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে চুঁচুড়ার একটি স্থানীয় ক্লাবের উদ্যোগে অবধূতের জন্ম শতবর্ষ উদ্‌যাপন করা হয়েছে বলে জানা গেলে। শতবর্ষ উপলক্ষ্যে তাঁর ওটুকুই বোধ হয় পাওনা ছিল।

তাঁর সৃষ্টির একটা অসমাপ্ত তালিকা পাওয়া গেলেও তাঁর জীবন - কথা পাওয়া যায় না। যেটুকু বা সংগ্রহ করা হয়, তার মধ্যে রয়েছে অগুনতি অসংগতি। হয়ত তার কারণও রয়েছে যথেষ্ট। কেন-না ব্যক্তিগত জীবনে প্রায় আঠারো বছর তিনি ভবঘুরের মতো ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছেন। দীক্ষা নিয়েছেন, সন্ন্যাস নিয়েছেন, ভৈরবী -সহ শ্মশানে মশানে রাত্রিবাস করেছেন ইত্যাদি। এভাবেই ভরে উঠেছে তাঁর বিচিত্র জীবনের অভিজ্ঞতার ডালি। কে তখন জানবে যে ভবিষ্যতে তিনি হয়ে উঠবেন শ্মশানের মহাকাব্য রচয়িতা অবধূত। তাই লেখক পরিচিতি বাদ দিয়েই লোকে তাঁকে বলতেন স্বামীজি, কেউ সাধুবাবা অথবা কেউ বলতেন শুধুই বাবা বলে। ভারতের হাজার হাজার কৌপীনধারী সন্ন্যাসীর ভিড়ে তিনি তখন নিশে রয়েছেন। আলাদা ভাবে তাই তাঁর জীবন-কথা কেউ মনে রাখেননি। তা -ছাড়া অবধূত নিজেও কোনও দিন খুলে বলেননি তাঁর ভবঘুরে জীবনের কথা। তাঁর বংশধরেরাও রয়ে গেছেন অন্ধকারে। তাঁদের বক্তব্য ও বিভিন্ন উৎস থেকে প্রকাশিত তথ্যের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ থেকে যায়। অন্যদিকে অনেকে আবার তাঁর উপন্যসগুলির চরিত্রের মধ্যেই তাঁকে ধরবার চেষ্টা করেন এবং সাল তারিখের পারম্পর্য খুইয়ে সত্য - মিথ্যার গোলকধাঁধায় হারিয়ে যান। জীবন- কথা তাই অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। পূর্ণ করার তাগিদ নেই কারও।

নিকটেই রয়েছে উদ্ধারণপুর মানে অবধূতের উদ্ধারণপুরের ঘাট। জীবন-কথা শোনানোর দায়বদ্ধতা তাই আমাদের এড়িয়ে যেতে সংকোচ হয়। সে-জন্যই এ-প্রবন্ধ এবং তাঁরই স্মরণে। তা-ও হয়ত অসম্পূর্ণ। ওদিকে উদ্ধারণবাসীরা মহাশ্মশানে অবধূতের আবক্ষ মূর্তি বসানোর উদ্যোগ নিয়েছেন।

অনাথনাথ মুখোপাধ্যায়ের আদি বাড়ি ছিল বরিশাল।[৩] সেখানেই থাকতেন তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যেরা। কিন্তু রেলিফ কোম্পানির অধীনে টাকায় দু-পয়সা কমিশনে ব্রোকার কিংবা তদারকিচাকরির সূত্রে তাঁকে কোলকাতায় এসে বসবাস করতে হয়। পরবর্তীকালে হয়ত তাঁরা উত্তর কলকাতার কোথাও মাথা গোঁজার মতো ছোট্ট বাড়িও কিনে থাকতে পারেন। কিন্তু তার কোনও নির্দিষ্ট প্রমাণ আজ নেই। অনাথনাথ ও প্রভাবতীদেবীর অনেকগুলি সন্তান - সন্ততির মধ্যে দুলালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হলেন অন্যতম। দুলালের জন্ম ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের কালীপুজোর পরের দিন, স্বভাবতই কার্তিক মাসে।[৪] জীবনের প্রথম পর্ব তিনি কাটান বরিশালের বাড়িতে পিতামহ গোপাল মুখোপাধ্যায়ের অভিভাবকত্বে। পিতা অনাথনাথের অজ্ঞাতসারে নাবালক অবস্থাতেই গোপালবাবু তাঁর আদরের নাতি দুলালের বিয়ে দেন অপূর্ব সুন্দরী অশিক্ষিতা এক গ্রাম্য বালিকা সরোজিনীর সঙ্গে। ওই বিয়েতে দুলালের পিতা অনাথনাথের কোনও সম্মতি ছিল না এবং তিনি তা কোনও দিন মেনে নিতেও পারেননি। সদ্য বিবাহিত দুলালকে তিনি তাই সঙ্গে করে নিজের কাজে নিয়ে আসেন কোলকাতায়। সেখানেই হয় দুলালের শিক্ষা-দীক্ষা। তিনি কত দূর পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিলেন তা সঠিক ভাবে জানা না-গেলেও পরবর্তীকালে দুলাল তাঁর শিক্ষক-তুল্য কীর্ণাহারের রামশম্ভুবাবুকে বলেছিলেন[৫]— 'আমাকে অন্তত বি.এ পাশ বলে ধরে নিতে পারেন।' তার মানে ১৯২৮ -২৯ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তিনি কলেজের ছাত্র ছিলেন। সম্ভবত সেসময়ই তিনি বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। তারপরেই পোর্ট কমিশন অফিসে চাকরি, মাসিক বেতন তিন-শো টাকা। কালটা ছিল ১৯৩২ -৩৩ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি। বলা বাহুল্য সেযুগে ওই মাইনেতে বিলাস-বহুল জীবন যাপন করা যেত। এক জায়গায় দুলালবাবু অবশ্য সেকথা প্রকাশ্যেই বলেছেন রামশম্ভুবাবুকে।

ছেলে ভালো চাকরি করছে। কাজেই তাঁর পিতা অনাথনাথ রিষড়ার এক সম্ভ্রান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের কন্যা সুখময়ী দেবীর সঙ্গে দুলালচন্দ্রের বিয়ে দিয়ে দেন মোটামুটি ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। বছর ঘুরতেই পুত্র অমলের জন্ম হয় মে মাসে কোলকাতা শিশুমঙ্গল হাসপাতালে এবং সুখময়ী দেবী আক্রান্ত হয় দুরারোগ্য সূতিকা রোগে। প্রচুর অর্থব্যয় হয় বটে কিন্তু শেষাবধি তাঁকে বাঁচানো যায় না। শোকে দুঃখে দুলালবাবু সংসারের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েন। সম্ভবত সেসময় তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। ঘটনাচক্রে শিশু পুত্রের দায় - দায়িত্ব গিয়ে পড়ে তাঁর ভাই মৃণালবাবু ও মা প্রভাবতী দেবীর উপর।[৬] মৃণালবাবু আর্মিতে চাকরি করতেন। সে-সুত্রে এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ আদি নানা দেশ তাঁকে ঘুরতে হয়। শিশু অমলকেও তাঁর সঙ্গে নানা দেশ ঘুরতে হয়েছিল। পিতা দুলাল তখন নিরুদ্দেশ। সালটা হবে মোটামুটি ১৯৩৫ এর শেষ।

আসলে অনেকে মনে করেন যে পোর্টট্রাস্ট অফিসে চাকরি করার সময় তিনি অতি সাহেবিয়ানা ভেক ধরে গোপনে বিপ্লবীদের অস্ত্র সরবরাহ করতেন। সম্ভবত বিপ্লবীদের কাছে তাঁর নাম ছিল রেবতী মুখোপাধ্যায়। বিদেশ থেকে জাহাজে অস্ত্র আসত এবং ওগুলি রাতে বিপ্লবীদের হাতে তুলে দিতেন দুলালবাবু। তাঁর এই গোপন কার্যকলাপ পুলিশের নজরে পড়তে দেরি হয় না। তাঁর নামে গ্রেপ্তারি পরোয়া জারি হয়।[৫] তিনি কোনও উপায় না-পেয়ে শিশু পুত্রকে পরিত্যাগ করে গোপনে পালিয়ে যান। কিন্তু পুলিশের জাল ছিঁড়ে তিনি বেশি দুর যেতে পারেন না, ধরা পড়ে যান এবং বীরভূমের নলহাটিতে কিছুকাল বন্দি থাকেন। কোনও ক্রমে সেখান থেকে পালিয়ে আরেক বিপ্লবী বন্ধু নিরঞ্জনের সঙ্গে গোপনে নৌকাযোগে পদ্মা পার হচ্ছিলেন। পুলিশ দেখতে পায় এবং তাদের গুলিতে নিরঞ্জন মারা যায়। নৌকা উল্টে ডুব সাঁতার দিয়ে কোনও ক্রমে তিনি বেঁচে যান বটে কিন্তু পুলিশ মনে করে গুলি খেয়ে সে-ই বুঝি গঙ্গায় ডুবে মারা গেছে। পুলিশের খাতায় সেদিন থেকে মৃত বিপ্লবীর তালিকায় তাঁর নাম ওঠে। তারপর থেকেই আসলে শুরু হয় তাঁর ভবঘুরে জীবন।[৫]

ভবঘুরে জীবনের বিস্তারিত ইতিহাস জানা যায় না। বিভিন্ন সুত্র এবং সরেজমিন তদন্ত থেকে যেটুকু বিক্ষিপ্ত ইতিহাস সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তা থেকে মনে হয় তিনি নিঃস্ব অবস্থায় দেশ-দেশান্তর ভ্রমণ করতে করতে হাজির হন প্রথমে গঙ্গাসাগরে। তারপর সেখান থেকে উজ্জয়িনী। সেখানে শিপ্রা নদী তীরে মহাকাল মন্দিরে তাঁর প্রাথমিক দীক্ষা হয় তন্ত্রমতে এবং তিনি ক্রমে এসে হাজির হন কাশীতে। সেখানে কিছুকাল কালী মন্দিরের পুরোহিতগিরি করে কেটে যায়। বোধ হয় কাশীবাসের অভিজ্ঞতারই কিয়দংশ রয়েছে তাঁর লেখা বশীকরণ গ্রন্থটিতে। কাশীতে তিনি বেশি দিন তিষ্ঠতে পারেন না। মোটামুটি ১৯৩৭ সাল নাগাদ সন্ন্যাসীর বেশে হাজির হন কাটোয়ার নিকটবর্তী উদ্ধারণপুর মহাশ্মশানে।[৭]

বহুকাল থেকে লোক শ্রুতি আছে যে উদ্ধারণপুর মহাশ্মশানের চুল্লি কোনও সময় নেভে না। কাজেই তাঁর শ্মশানবাসের অভিজ্ঞতার ঝুলি কিছুদিনের মধ্যেই সার্থকভাবেই পূর্ণ হয়ে ওঠে। কালক্রমে উদ্ধারণপুরের ঘাট নামে শ্মশানের মহাকাব্য লিখে তিনি যশস্বী হন।—

উদ্ধারপুরের ঘাট। কান্নাহাসির হাট।...

...শ্মশানের উত্তর দিকের সীমায়— একটি উঁচু ঢিবি। ঢিবির পিছনেই আকন্দ গাছের জঙ্গল। সেই ঢিবির উপরেই ছিল আমার গদি।

তোষকের উপর তোশক, তার ওপর আরও তোশক, তার ওপর অগুনতি কাঁথা লেপ কম্বল চাপাতে চাপাতে আমার সেই সুখাসন মাটি থেকে দু'হাতের ওপর উঁচুতে উঠে গিয়েছিল। এখানে গিয়ে প্রথম যেগুলি পেতেছিলাম সেগুলো ক্রমে ক্রমে মাটিতে পরিণত হচ্ছিল। তা হোক না, আমার কি তাতে? আমার তো অভাব ছিল না কোনও কিছুর। রোজই কিছু কিছু নতুন জিনিস চড়ছেই আমার গদিতে। কাজেই একেবারে তলারগুলোর জন্যে মন খারাপ হত না।...

উদ্ধারণপুরের নিকট-দক্ষিণেই এনায়েতপুর কালীবাড়ি, জঙ্গলাকীর্ণ প্রাচীন ভয়ঙ্কর সাধন-স্থল।[৮] অনেকে বলেন, প্রতি রাতে অবধূত সেখানে যেতেন। সারারাত নাকি চলত তন্ত্র-মন্ত্র সাধনা। অসম্ভব নয়।

উদ্ধারণপুরের ঘাট গ্রন্থে নিতাই বোষ্টমি ও চরণ দাস নামে দু'টি চরিত্র আছে। ওই নামেই হোক বা অন্য নামে হোক ওই যুগল চরিত্র কাল্পনিক ছিল না মোটেই। বাস্তবে তাঁরা ছিলেন রক্তমাংসের মানুষ এবং একে অপরের সঙ্গে প্রেম বন্ধনে ছিলেন বাঁধা। মনে হয় অবধূত তাঁর অজ্ঞাতসারেই নিতাই বোষ্টমির সুখ দুঃখের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ত্রিভুজ তৈরি করেছিলেন। অবধূতের সন্ন্যাসী জীবনের বিরাট দ্বন্দ্ব বুঝি সেখানেই।

... সেই কথাই বলে নিতাই বোষ্টমি। বলে— বল না গোঁসাই, কি করে এই দেহটাকে একবার ঝলসে নেওয়া যায়। ঝলসে আঙার করে নিতে পারলে আর এটার দিকে চেয়ে কারও জিভ দিয়ে লালা গড়াতো না। গলার কন্টি পরে নাকের রসকলি এঁকে জীবনটা কাটালাম শুধু মাংস বেচে। আর ভাল লাগে না এই রক্তমাংসের কারবার করা। তুমি মজা পাও দিনরাত মাংস পোড়া গন্ধ শুঁকে। কাঁচা রক্ত মাংসে তোমার রুচি নেই। চিতায় উঠে আগুনে ঝলসে কালো কয়লা হয়ে যাচ্ছে না-দেখলে তোমার মন ওঠে না। তাই ত ছুটে ছুটে আসি তোমার কাছে। দাও না গোঁসাই একটা উপায় বলে, যাতে এই হাড় মাস পুড়ে কালো আঙার হয়ে যায়। যা দেখে আর কারও হ্যাংলামো প্রবৃত্তি হবে না।[৯]

অকালে প্রেমিক চরণ দাস মারা যায়। তার নগ্ন দেহ চাক্ষুস করে বোঝা যায়, চরণ দাস ছিল নপুংশক। আর তখনই নিতাই বোষ্টমির ওই আকুলির একটা অর্থ খুঁজে পান অবধূত। হয়ত নিজেকে তখন অপরাধী বলেও মনে হতে থাকে। তাই, আর কাল বিলম্ব না করে দমবন্ধ -করা উদ্ধারণপুরের পরিবেশ থেকে পালিয়ে বাঁচেন তিনি। চলে যান বহুদূর বহু দূর, ব্রহ্মদেশে মায়ানমার। সালটা হবে মোটামুটি ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ। কিন্তু শান্তি কোথায়! তিতি বিরক্ত হয়ে বহু দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে সঙ্গে নিয়ে শেষে হাজির হন বরিশালে, তাঁর প্রথম পক্ষের শ্বশুরবাড়ি।[১০] শ্যালক রয়েছেন মহেন্দ্র ব্যানার্জি। বধূ সরোজিনী তখন পূর্ণ যুবতি। তিনি গ্রামবাসীর সাহায্য নিয়ে বহু জায়গায় ঘুরে এসেছেন কিন্তু স্বামীর সন্ধান এতদিন কোথাও পাননি। আজ তাঁর বাড়িতেই তিনি হাজির। তাঁরে ছেড়ে দেন কী করে! অবধূতের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরেন সরোজিনী। অবধূত পড়েন মহা বিপাকে। কেন-না তিনি পূর্ণ সন্ন্যাস নিতে আগ্রহী কাজেই সরোজিনীকে সঙ্গে নেন কী করে! সন্ন্যাস জীবন বড়ো কঠোর জীবন। কোনও মতেই সরোজিনীকে নিরস্ত করা যায় না। তিনিও ভৈরবী হয়ে তাঁর সঙ্গে কৃচ্ছসাধন করতে প্রতিজ্ঞা-বন্ধ হন। কী আর করেন অবধূত। তখন মোটামুটি ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ। পূর্ববঙ্গের যা-অবস্থা তাতে সুন্দরী স্ত্রীকে সেখানে রাখাটা মোটেই নিরাপদ হবে না। এসব নানা কথা চিন্তা করে সরোজিনীকে সঙ্গে নিয়েই তিনি বেরিয়ে পড়েন কামাখ্যার পথে। সেখানে দু'জনে তান্ত্রিক মন্ত্রে দীক্ষিত হন এবং যুগলে মিলে শুরু করেন এক ভবঘুরে জীবন সাধনা।

মহাপ্রভুর জন্মভূমি নবদ্বীপধামে হাজির হন দুজনে। সেখান থেকেই যাত্রা শুরু হয় তাঁদের। নবদ্বীপে অবধূত দম্পতির সব কিছু চুরি হয়ে যায়। নিঃস্ব অবস্থায় এসে হাজির হন লাভপুর ফুল্লরা পীঠে। সরোজিনী তখন পূর্ণ যুবতি। তীর্থযাত্রীদের চোরা দৃষ্টিতে তিনি ক্রমশ বিদ্ধ হতে থাকেন। অস্বস্তি বাড়ে। আর এখানে থাকা যায় না। তিন দিনের মাথায় তাঁরা লাভপুর ত্যাগ করে দশ কিলোমিটার পূর্বদিকে হাজির হন শিয়ালদহ তথা মুণ্ডমালিনা তলায়।[১১] সালটা তখন হবে সম্ভবত ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ।[১২] রামশম্ভু বাবুর ডায়েরি অনুসারে তিনি সেখানে ছিলেন প্রায় সাড়ে তিন থেকে চার বছরের মতো। জায়গাটা ছিল নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ, জনবসতিহীন। ছিল একটি কুঁড়ে ঘর, লোকে বলত কালীমন্দির। সেখানেই কোনও সাধক কোনও কালে পঞ্চমুন্ডির একটি আসন পেতেছিলেন। পাশ দিয়ে ছোট্ট একটি ঝিরঝিরে জলধারা। দূরে পশ্চিমে রয়েছে মহেশপুর গ্রাম। আরও কিছু দূরে পূর্বে কীর্ণাহার।

অবধূতের সঙ্গে রয়েছে ভৈরবী মা সরোজিনী দেবী। মানুষজনের সঙ্গে তাঁদের কোনও পরিচয় নেই, মাধুকরীও করা সম্ভব হয়নি প্রথম কয়েক দিন। প্রথম দুদিন কেটেছে জঙ্গলের বেল-পোড়া আর কাঁদড়ের কাঁকড়া-সেদ্ধ খেয়ে। ওদিকে মাঠের চাষিরা পরম কৌতুহল ভরে তাঁদের দেখতে এসেছেন এবং গ্রামে - গ্রামে রটে গেছে এক বিচিত্র কল্প-কথা। ডোম জাতির এক সন্ন্যাসি এসেছে মুচি সম্প্রদায়ের এক অপূর্ব সুন্দরী কন্যাকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে। আখড়া গেড়েছে মুণ্ডমালিনীতলায়। ১৩ সে-গুজব বারান্দা গ্রাম নিবাসী ডাঃ অমূল্যরতন চক্রবর্তীর কানে আসে এবং তিনি কথাটা তোলেন কীর্ণাহার শিবচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রামশম্ভু গঙ্গোপাধ্যায়ের কানে। রামশম্ভুবাবু ছিলেন পন্ডিত ও এক সেবাব্রতী মানুষ। তা - ছাড়া স্বভাবে ছিলেন সন্ন্যাসী - পাগল। তিনি ছুটে যান মুন্ডমালিনীতলায়। অবধূতের সঙ্গে কথাবার্তা হয় এবং তাঁর জন্য সিধার ব্যবস্থা করেন। সেদিন থেকে অবধূত রামশম্ভুবাবুকে মাস্টারমশাই-এর মতো শ্রদ্ধা করতে থাকেন। আর রামশম্ভুবাবু অবধূতের কাছে সাধনার নানা প্রকরণ শিখে নেন। কার্যত দুজনের ভূমিকা হয়ে দাঁড়ায় সাধক ও দেশ-সেবকের।

রামশম্ভুবাবুর স্কুল-ভবন তখন ছিল অতি সাধারণ। কোনও পাকা অট্টালিকা ছিল না। অথচ তাঁর ইচ্ছে ছিল একটি স্থায়ী পাকা স্কুল-ভবন তৈরি করা। বাসনার কথা প্রথম প্রকাশ করেন অবধূতের কাছে। অবধূত তাঁকে দৃঢ়তার সঙ্গে কাজে লেগে যেতে বলেন। আশ্বস্ত করেন এই বলে যে তিনি প্রতিদিন ँমার কাছে প্রার্থনা করবেন। ভয় কী! এবং আশা করা যায় অচিরেই। হাজার হাজার টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। কার্যত দেখা যায় তাঁরা দুজনেই বস্তা নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরছেন, সঙ্গ নিলেন কবিরাজ শঙ্করঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহায্য পাচ্ছেন আশাতীত। ক্রমে ভরে

উঠেছে তাঁদের ভিক্ষার ঝুলি। স্বভাবতই তৈরি হয়ে গেল পাকা বিদ্যালয় ভবন।

অবধূত আবার মেতে পড়লেন দেশসেবার কাজে। ক্রমাগত খরায় ও বন্যায় দেশে এল দুর্ভিক্ষ (১৯৪২-৪৩ খ্রিস্টাব্দ)। রামশম্ভুবাবুকে সঙ্গে নিয়ে শুরু করলেন খাদ্য সংগ্রহ অভিযান। সম্পন্ন গেরস্থেরা সন্ন্যাসীর উদ্যোগ দেখে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলেন। শুরু হয়ে গেল শিয়ালদহ আশ্রমে এক অনবচ্ছিন্ন অন্নসত্র, প্রায় আড়াই মাস কাল। সে-এক এলাহি ব্যাপার। কোথা থেকে এতজন লোকের অন্ন সংগৃহীত হচ্ছে কেউ জানে না। সন্ন্যাসী নিজে পরিবেশন করেছেন, নিজের বুকে চিরে বেলপাতায় রক্ত লাগিয়ে মাকালীর সামনে নিবেদন করেছেন। রাত আর দিন হয়ে গেছে একাকার। মা ভৈরবীও দিনরাত কাজ করে চলেছেন কিন্তু অবগুণ্ঠন ভেদ করে তাঁর মুখমন্ডল দেখার সৌভাগ্য কারও হয়নি তখনও। এমনকী অবধূতের অতি নিকট সুহৃদ মাস্টার মশাই রামশম্ভুবাবুরও।

শুরু হয় আর এক উদ্যোগ। মা কালীর পাকা মন্দির নির্মাণ করতে হবে, বসাতে হবে মার প্রতিমা। যেই না ভাবা সেই না কাজ। মুণ্ড মালিনীতলা তথা কীর্ণাহারের জনপ্রিয় জমিদার সৌরেশচন্দ্র সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন। তাঁদের তখন আর্থিক সঙ্গতি নিম্নগামী, অর্থ দিয়ে তিনি কোনও সাহায্য করতে পারলেন না। তবে মুন্ডমালিনী তলার মূল্যবান গাছগুলি বিক্রয় করে অর্থ সংগ্রহের সম্মতি দিলেন। তা- থেকে এবং ভক্তদের চাঁদা ইত্যাদি মিলিয়ে দেবীর ছোট্ট নাটমন্দির ও ছোট্ট পাকা মন্দির নির্মিত হল। প্রতিষ্ঠিতা হলেন তিনটি মৃন্ময়ী দেবীমূর্তি মহালক্ষ্মী, মহাকালী ও মহাসরস্বতী। মহা আড়ম্বরে অভিষেক উৎসব অনুষ্ঠিত হল। যাত্রা হল, নানা রকমের বৈঠকী গান-বাজনার আসর চলল, দেশের মানুষ ওই ক'দিন একেবারে মশগুল হয়ে রইলেন। তদুপরি সকলেই পেলেন দেবীর প্রসাদ, মাংস ও পর্যাপ্ত অন্নভোগ...

এর পরে সরাসরি ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বরের আগে থেকে লেখা রামশম্ভু গঙ্গোপাধ্যায়ের ডায়েরির অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করা যায়। তা-হলে ঘটনা প্রবাহের একটি অবিকৃত ইতিহাস পাওয়া যাবে সেখানে।

'একদিন শুনলাম স্বামীজী ভৈরবী মায়ের সহিত মুন্ডমালিনী আশ্রম ত্যাগ করে জিউই কালীবাড়িতে চলে গেছেন। আমি তাঁকে খুবই ভালোবেসে ফেলেছিলাম। অগ্রহায়ণের অমাবস্যার দিন ছিল সেদিন। আকাশ ছিল মেঘলা।...বাটী হাতে বহির্গত হয়ে মহেশপুরে ট্রেন ধরলাম। ট্রেনে আহম্মদপুর। সেখান থেকে গিয়ে সাঁইথিয়াতে নামলাম। সাঁইথিয়া হতে পদব্রজে জিউই কালীতলা চারি মাইলের উপর হবে। ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি। জিউইএ প্রাচীন ভৈরবী মা। স্বামীজীর সহধর্মিনী ভৈরবীও ছিলেন। কিন্তু স্বামীজী ছিলেন না। প্রাণের সুহৃদ কালিকানন্দ অবধূতের সঙ্গে সেদিন আমার দেখা হল না। এই প্রথম তাঁর স্ত্রী মাথার কাপড় মাথায় তুলে দিয়ে আমাকে মুখ দেখালেন এবং আমার সঙ্গে ব্যাক্যালাপ করলেন। মুণ্ডমালিনীতলায় প্রায় সাড়ে তিন বৎসরের মধ্যে একদিনও তাঁর মুখ দেখি নাই বা কথা শুনি নাই।

চারটি মুড়ি বাতাসা কলা ভিজিয়া খেয়ে কালীমাতাকে ও ভৈরবী মাতা দুইজনকে প্রণাম করে পাড়ি জমালাম আহম্মদপুরের পথে। চারি ক্রোশ (আট মাইল) পথ ভেঙে আহম্মদপুরে ট্রেন ধরলাম এবং সন্ধ্যা সাতটায় বাড়ি পৌঁছলাম।...

তারপর অনেকদিন অবধূতের কোন সংবাদ পাই নাই। ইতিমধ্যে তিনি ছিলেন মুর্শিদাবাদের জাজানে। সেখানে মামলা মকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েন।'[১৪]

রামশম্ভু বাবুর ডায়েরি অনুসারে মুন্ডমালিনীতলা থেকে অবধূত গোপনে চলে যান বীরভূমের সাঁইথিয়া ব্লকের অন্তর্ভুক্ত ফুলুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন জিউই গ্রামে। গোপনে চলে যাওয়ার কারণ কী ছিল জানার উপায় আজ আর নেই। তবে অনুমান করা যায় পুলিশের নজর এড়াবার জন্যই তিনি নানা রকমের কৌশল অবলম্বন করতেন। এটাও তার অন্যতম। কোথাও বেশি দিন থাকলে পরিচয়ের পরিধি বেড়ে যেত, পুলিশের নজর আসার সম্ভাবনাও বাড়ত, কাজেই চলে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় থাকত না। আবার সেজন্যই তিনি নিজেকে কখনও মুচির সন্তান বা কখনও ছুতোরের সন্তান বলে পরিচয় দিতেন। জিউই-তে তেমনই নিজেকে ছুতোর বলে পরিচয় দিয়েছিলেন।

জিউই কালীতলা লুকোনোর মতো একটি ভালো জায়গা বটো গ্রাম থেকে প্রায় এক মাইল পশ্চিমে মাঠের মাঝখানে জঙ্গলাকীর্ণ একটি নির্জন জায়গায় থাকতেন এক ভৈরবী -মা। এখনও সে-গ্রামের মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। অবধূত দম্পতি তাঁর কাছে গিয়ে আশ্রয় নেন। ছিটে - বেড়ার ঘর তৈরি করে বৃদ্ধা ভৈরবীমার স্নেহে সন্তানের মতো তাঁরা সেখানে থেকে যান। মা ভৈরবী তাঁদের মাধুকরী করতে দিতেন না। গ্রামের মানুষেরা যেটুকু সিধে পাঠাতেন তা থেকেই তাঁদের চলে যেত। তার মধ্যেই সে-অঞ্চলের সকলেই তাঁকে একটু অন্য চোখে দেখতে আরম্ভ করেন। সঠিকভাবে তাঁর পরিচয় না-পেলেও তাঁরা বুঝতে পারেন নতুন সন্ন্যাসী অবশ্যই উচ্চ-শিক্ষিত, একটু ভিন্ন প্রকৃতির। তিনি সকলকে নিয়ে দোলের সময় এ মহোৎসব চালু করেছিলেন। সে-উৎসব এখনও হয়ে আসছে। ২০১০ খ্রিস্টাব্দের ২৭ ফেব্রুয়ারি জিউই গ্রামে গিয়ে বহু প্রবীণ মানুষের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে অভয়াকান্ত মুখার্জি (বয়স ৭৭ বৎসর), সুনীতি মুখার্জি (৭৫), ধ্বজাধারী চট্টোপাধ্যায় (৭৪), প্রভাত কুমার চৌধুরী (৮০), মন্দিরের বর্তমান পূজারি অমিয় চট্টোপাধ্যায় (৭০ প্রায়) এবং বয়োজ্যেষ্ঠ নবনীগোপাল মুখোপাধ্যায় (৮৩) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। নবনীবাবুর কথামতো—তখন তাঁর (অবধূতের) বয়স ছিল আনুমানিক তেত্রিশ চৌত্রিশ বছর। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। স্ত্রী অসাধারণ সুন্দরী। তিনি দু-টি বেড়াল ও দু-টি শেয়ালকে আদর করে খাওয়াতেন। এ ব্যাপারটি গ্রামবাসীদের বিস্ময়ের সৃষ্টি করত। হঠাৎই তিনি সেখান থেকেও উধাও হয়ে যান। আসলে তিনি সেখান থেকে চলে যান জদানে।

জজানে স্থিতিকলের পূর্ণ বিবরণ রামশম্ভুবাবু বিশেষ কিছু জানতেন না বলে তিনি তাঁর ডায়েরিতে সে-প্রসঙ্গে কিছুই লিখে যেতে পারেননি। তবে সে বিবরণ এখনও পাওয়া যায় জজানের মানুষের কাছে।[১৫] মোটামুটি ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি জজানে ছিলেন এবং জমিদার তথা তৎকালিক ইউনিয়নবোর্ডের প্রেসিডেন্ট ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, গ্রাম ঢুকতেই দিঘির পাড়ে একটি মাটির ছোটো ঘর তাঁদের বসবাসের জন্য তৈরি করে দিয়েছিলেন। সে-জায়গায় বর্তমানে রয়েছে মিলনী গ্রামীণ গ্রন্থাগার (স্থাপিত ১৯৫১) নামে একটি পাঠাগার। অবধূতের কোনও স্মৃতি সেখানে আজ আর নেই অবশ্য জজানে পদার্পণ করে প্রথমদিকে তিনি সর্বমঙ্গলা মন্দিরের পাশে পাতাল ঘরে থাকতেন এবং দুজনে সেখানেই সাধন-ভজন করতেন।

দেখা যাচ্ছে, কীর্ণাহারে রামশম্ভুবাবুর মতো জজানেও তিনি পেয়ে গেছিলেন প্রভাবশালী জমিদারের সান্নিধ্য। তাই সেখানেও অবধূতকে মাধুকরী করে গ্রাসান্ন সংগ্রহ করতে হত না। জমিদার-বাড়ি ও গ্রামবাসীদের কাছ থেকে নিয়মিত সিধা আসত। ভৈরবীসহ তাঁরা স্বপাকে তা রান্না করতেন। শিষ্যের মতো কাছে থাকতেন সত্যকিঙ্কর নামে এক যুবক। অবধূত তাকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। অবধূত দম্পতি পরতেন গেরুয়া বসন। তন্ত্র সাধনা করতেন দুজনেই। বয়স তখন পঁয়ত্রিশ কী ছত্রিশ। শরীরও ছিল সুঠাম। গ্রামের বয়স্ক মানুষেরা এখনও স্মরণ করতে পারেন যে তাঁর ভৈরবী ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী এবং মার্জার বিলাসিনী।

অচিরেই অবধূত গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। স্বভাবসিদ্ধ ভাবে বিভিন্ন সামাজিক কাজে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকেন। দু দু'বার গৌরী পুজোর উৎসব করেন। দুর্দিনে গরিব-দুখিদের জন্য খুলে বসেন লঙ্গরখানা। কীর্ণাহারের মতো গ্রামে গ্রামে ঘোরেন সাহায্যের ঝুলি কাঁধে নিয়ে। ক্রমে ছোটো থেকে বড়ো সকলে সহজেই তাঁর পুণগ্রাহী হয়ে ওঠে। শিশুদের নানা নামে ডেকে কৌতুক করতেন। তাঁরা তাঁকে পেলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেত। তিনি কাউকে ডাকতেন ঘন্টা বলে আবার কাউকে কাঁসর ইত্যাদি বলে, এভাবেই জমে উঠত মজা।

জজানে সর্বমঙ্গলা মন্দির অত্যন্ত জনপ্রিয়। কিন্তু মন্দিরটি তখন ছিল মাটির। অবধূত ওই মন্দিরটিকে পাকা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ভিতর পর্যন্ত গাঁথা হয়ে যায়। এমন সময় জমিদার বংশের অন্যতম শরিক কুমারকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় বাধা দেন। অবধূত তাঁর কথা না-শোনায় কার্যত তাঁকে অপদস্থ করা হয়। এমনকী কান্দি কোর্টে তাঁর বিরুদ্ধে একটি মোকদ্দমাও রুজু হয়ে যায়। দুঃখে এবং অভিমানে তিনি অচিরেই সে-গ্রাম ত্যাগ করে চলে যান। মামলা অবশ্য বেশি দিন টেকে না। অবধূতের সঙ্গে সত্যকিঙ্কর ও শিষ্যের মতো অনুগমন করে। কিন্তু কিছু দিনের পরে অবধূত তাকে সংসার করার আদেশ দেন। সে স্বগ্রামে ফিরে এসে বিয়ে করে জয়ন্তী নামে এমন বালিকাকে। জয়ন্তী দেবী এখনও জীবিত আছেন এবং অবধূতের সঙ্গে তাঁর স্বামীর ঘনিষ্ঠতা স্মরণ করতে পারেন।

জজানে যখন ছিলেন তখন গ্রামের মানুষের কাছে তিনি একজন সাধু বই কিছু ছিলেন না। কুড়ি বছর পর নেহাতই কৌতুহল বশত দুদিনের জন্য তিনি জজানে এসেছিলেন। তখন তিনি রীতিমতো খ্যাতিমান লেখক অবধূত। স্বরাজ কুমার ঘোষ নামে এক গ্রামবাসী অবধূতকে জিজ্ঞেস করেছিলেন— কী, আমাকে চিনতে পারছেন? হেঁয়ালি করে অবধূত জবাবে বলেন— তোকে চিনতে হলে কুড়ি বছর আগের চেহারায় ফিরে যেতে হবে রে ঘন্টা, বুঝলি? বুঝতে বাকি থাকে না যে বাল্যকালে অবধূত তাঁকে ঘন্টা নামেই ডাকতেন।

এর পরের ঘটনায় কিয়দংশ লিখেছেন রামশম্ভুবাবু। 'তারপর যান তীর্থভ্রমণে। মরুতীর্থ হিংলাজ গিয়েছিলেন। পরে যান পূর্ব পাকিস্তান সেখানে একটি সিদ্ধ পীঠ উদ্ধার করেন। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হয় যে অবধূত ভারত সরকারের গুপ্তচর। অতএব অবধূত সস্ত্রীক চলে আসেন পশ্চিমবঙ্গে।..' '...চুঁচুড়ার জোড়া ঘাটের উত্তর পার্শ্বে গঙ্গার তীরে একটু ভূমি সরকারের নিকট সংগ্রহ করলেন অবধূত। রিফিউজি ঋণ পেলেন গৃহ নির্মাণের জন্য। গেঁথে তুললেন একতলা ইষ্টকালয়।...' এর পরে তিনি '...চুঁচুড়ায় বাস করতে থাকেন। এখানে বসে লিখে ফেলেন 'মরুতীর্থ হিংলাজ'!...[১৪]

পুত্র অমলকে অসহায় অবস্থায় রেখে অবধূত গৃহত্যাগ করেছিলেন। তার সুদীর্ঘকাল পরে তিনি চুঁচুড়ায় গিয়ে হাজির হন। অমলের সঙ্গে মিলন হয় তারও পরে। গৃহত্যাগ থেকে পুনর্মিলন পর্যন্ত কাল-ব্যবধানের বিবরণ সঠিক কোথাও পাওয়া যায় না। এমনকী অবধূতের উত্তরসূরিরাও বিশেষ কিছু বলতে পারেন না। বহু চেষ্টা, সদ্য আবিষ্কৃত রামশম্ভু বাবুর ডায়েরি ও বিভিন্ন জায়গায় সরেজমিনে তদন্ত করে এই প্রথম অবধূতের অজ্ঞাতবাসের কিয়দংশ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তার সারসংক্ষেপ—

এমনিতেই অবধূত কোনও জায়গায় বেশি দিন থাকতে পারতেন না। এটা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা বলা চলে সন্ন্যাসীদের রীতি। তাই অনুমান করা যায় মোটমুটি ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে কীর্ণাহারের জমজমাট আশ্রম থেকে হঠাৎ বিদায় নিয়ে তিনি কিছুদিন সাঁইথিয়ার কাছে জিউই কালীবাড়িতে ছিলেন। তারপর চলে যান মুর্শিদাবাদের জজানে। ১৯৮৪-৪৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সেখানে থাকেন। মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমা শহরের কাছেই পড়ে প্রাচীন গ্রাম জজান। সেখানে তিনি কিছুদিন থাকেন বটে কিন্তু এভাবে চেনাজানা বঙ্গীয় পরিবেশে বেশি দিন কাটাতে তাঁর মন একেবারেই চাইছিল না। তাঁর উপরে একটি শুভ কাজ করতে গিয়ে তিনি বিফল হন। তাই তিনি ভৈরবীকে সঙ্গে নিয়ে চলে যান তীর্থ-ভ্রমণে, সূদূর হিংলাজ পর্যন্ত। ভ্রমণের বিস্তারিত বিবরণ আজও অজ্ঞাত। তবে তাঁর লেখা মরুতীর্থ হিংলাজ গ্রন্থের বেশ কয়েকটি চরিত্র যে বাস্তব ছিল, একথা তিনি নিজ মুখেই তাঁর পুত্রবধূ সুচনাদেবীকে বলেছিলেন।—

'সবচেয়ে বেশি শুনেছি হিংলাজের গল্প। বাবার কাছেই শুনেছি ফেরার পথে কেমন ভাবে হারিয়ে গেছিল কুন্তী আর থিরুমল। গল্পে যে 'পপেটলার' চরিত্রের কথা আছে, তিনি ফিরে এসে আসামে একটি বিড়ির কারখানা বানান। আমার বিয়ের পরেও বাবার সাথে তাঁর পত্রালাপ ছিল। একমাত্র আমাকেই বলেছিলেন— হিংলাজের পবিত্র গুহার অন্ধকারে স্বর্গীয় জ্যোতিঃদর্শনের অভিজ্ঞতার কথা। সে-কথা মনে পড়লে এখন্য গায়ে কাঁটা দেয়।'[১৬]

'মরুতীর্থ হিংলাজ বর্ণিত বিখ্যাত ভৈরবীকে আমরা দেখেছি। শ্যামবর্ণা, স্থূলকায়া মহিলাটি, মাথায় ডগ্ ডগ্ করছে সিঁদুর, কপালে বিশাল এক সিঁদুরের টিপ। ঠোঁট দুটি সর্বদাই তাম্বুল রসে রঞ্জিত-পরণে চওড়া লালপাড়ে সাদা শাড়ি। কিন্তু চোখের কোলে তাঁর স্নেহ ও ভালবাসা যেন ঝিক্‌মিক্ করছে। তাঁর ছিল একপাল বেড়াল। দুপুরে আহারের শেষে তিনি ঘাটের উপর দাঁড়িয়ে এক বিচিত্র স্বরে সেই ষষ্ঠী ঠাকরুণের বাহনদের আহ্বান জানাতেন— সেই স্বরক্ষেপণটা অনেকটা উলুধ্বনির মতো। —দেখতে দেখতে চতুর্দিক থেকে গোটা দশ বারো বেড়াল হাজির হত তাঁর পায়ের কাছে। মা যেভাবে তাঁর সন্তানদের খেতে দেন - তিনিও সেই ভাবে কখনও বকুনি দিয়ে, কখনও বা আদর করে তাদের খেতে দিতেন। ...'[১৭] বলা বাহুল্য লেখক হিংলাজ ভ্রমণের সময়কার যে ভৈরবীর কথা বলেছেন তিনি আর কেউ নন তিনিই অবধূতের প্রথমা স্ত্রী (?) সরোজিনী দেবী। মার্জার বিষয়ক ঘটনাটি অসলে চুঁচুড়োর বাড়ির। আজও সে-বাড়ির ঠাকুরঘরে দুটি ত্রিশুল রাখা আছে। সূচনা দেবী বলেন যে-ওই ত্রিশূল

দুটিই মরুতীর্থ হিংলাজ যাত্রার সময় অবধূত ও ভৈরবী ব্যবহার করেছিলেন।

জজান ছেড়ে-যাওয়া ও ১৯৫১-৫২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ চুঁচুড়োর স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণের মাঝে তিনি যেমন হিংলাজ ভ্রমণ করেছিলেন তেমই গেছিলেন হিমালয়। এ-দুটি ভ্রমণই তিনি সেরেছিলেন স্বাধীনতার পরে। ঘটনা যা-ই হোক না কেন অবধূত নানা জায়গা ঘুরে এসে ঠিক করলেন একটা স্থায়ী আস্তানা তাঁর এখন দরকার। কেন-না ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও সঙ্গ-চরিত্রগুলিকে নিয়ে একটা কিছু লেখার তাগিদ তিনি তখন গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। মাথায় সে-চিন্তাই সব সময় ঘুরপাক খাচ্ছিল। সরকারের কাছে আবেদন করলেন। সরকার বাহাদুর তখন পূর্ববঙ্গ থেকে আগতদের নানা ভাবে সাহায্য করছেন এবং তাঁদের একটা স্থায়ী আস্তানার জন্য প্রায় বিনামূল্যে ভূমি দান করছেন। সৌভাগ্য বশত অবধূত সে-সুযোগটা পেয়ে যান।'[১৮] এক চিলতে জায়গা পান চুঁচুড়োর জোড়া ঘাটের লাগোয়া। ঋণ মঞ্জুর হয় গৃহ নির্মাণের। গঙ্গার গায়েই তৈরি হয় ছোট্ট একতলা বাড়ি। অতিবৃষ্টিতে বা ঘোর বর্ষায় গঙ্গার জল বাড়ে। কখড়ও কখনও গঙ্গাজলে তাঁর একতলা পর্যন্ত ডুবে যায়। তিনি ছাদে তাঁবু খাটিয়ে কোনওভাবে সেসময়টা কাটিয়ে দেন। ১১ জুলাই ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে চুঁচুড়োয় গিয়ে দেখা যায় বাড়িটি এখনও সে-অবস্থাতেই আছে, বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয়নি।

রাস্তার উপরেই বাড়ি। তাপরই ভাগীরথী। মাঝখানে ছোট্ট একটা চড়া। অবধূত প্রায়শ ওই চড়ায় গিয়ে সাধন-ভজন করতেন। ওপারে নৈহাটি, অবদূতের বন্ধু সমরেশ বোসের আস্তানা। বাড়ির ডানদিকে গঙ্গা-স্নানের ঘাট, বামদিকে বটতলায় পঞ্চমুন্ডির আসন। বাড়ি ঢুকেই বামদিকে পড়ে ঠাকুর ঘর। ছাদে ওঠার একটি সিঁড়ি। দেওয়ালে ঠাকুর দেবতা, অবধূতের গুরু-গুরুমা, মা-বাবা প্রমুখের ফটো টাঙানো, সামনেই একটি কাঠের সিংহাসনে মা কালীর ছবি, পাশে ডানদিকে অবধূত ও ভৈরবী ব্যবহৃত ত্রিশূল, মেঝেতে পুজোর আসবাব পত্র ইত্যাদি। সরু একটি বারান্দা। বারান্দা পেরিয়ে ঢুকতে হয় বসার তথা শোবার ঘরে। বর্তমানে সে-বাড়িতে রয়েছেন অবধূতের পুত্রবধু সুচনাদেবী, পৌত্রদ্বয়, পৌত্র-বধূদ্বয়, প্রপৌত্র অন্বেষণ। তাঁরা সকলেই অবদূত দম্পতির অতিথি বাৎসল্যের ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন।

বাড়ি তথা রুদ্রচন্ডীমঠ তৈরির সময় অবদূতকে প্রচন্ড পরিশ্রম করতে হয়। শরীর ভেঙে পড়ে। অর্থ সংকটও শুরু হয়। ওদিকে মরুতীর্থ হিংলাজ লেখা শেষ হয়েছে। ওটাকে ছাপাতে হবে। কিন্তু প্রথম লেখা, ঠিকঠাক হল কিনা বুঝতে পারছেন না। এমন সময় এল এক সুযোগ, সুযোগটা যে কী তা সরাসরি জনা যায় অমৃত পত্রিকার ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের ১২ মে-প্রকাশিত গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের লেখা 'দুই দিকপালের মুখোমুখি' নিবন্ধ থেকে।— 'তারাশঙ্কর খুব অধীরভাবে পায়চারি করছেন— 'চলো চলো, বেলা হয়ে গেল।' কোথায়? চুঁচুড়া।... কথায় কথায় জানলাম চুঁচুড়ায় যাওয়া হচ্ছে গঙ্গাতীরে একটি আশ্রম দেখতে। সন্ন্যাসীর আর্থিক অবস্থা ভাল নয় বিক্রি করতে চান।... চুঁচুড়ার রায়েরা বিখ্যাত পরিবার এবং সুবোধ রায় নিজে কবি। তিনি গোটা ব্যাপারটা তদারক করছেন। তাঁদের বাড়িতে সন্ন্যাসী এলেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্বেতবস্ত্রাচ্ছাদিত সন্ন্যাসীর আসল রং ফুটে উঠল। উনি হিংলাজ তীর্থ দর্শন করে এসেছেন এবং তার কাহিনী লিখেছেন। একেবারে হাতে খড়ি। নিজে ঠিক বুঝতে পারছেন না কেমন হয়েছে। তাই তাঁর বড় ইচ্ছে আমাদের একটু মতামত যাচাই করা। আপত্তি কি, শুরু হল। ...শেষ পর্যন্ত আশ্রমটা কেনার সংকল্প চুঁচুড়াতেই খারিজ হয়ে গেল। কিন্তু ওই হিংলাজের কাহিনী... গাড়িতে চড়ে বসল আমার সঙ্গে। ইতিমধ্যে বড় বাবু আমার ধারণার বড় শরিক হয়েছেন। অর্থাৎ লেখকের এটাই প্রথম লেখা নয় এবং কলমে বেশ চমক আছে। গাড়িতে ওঠার সময়ে পাণ্ডুলিপি নেওয়ার কথা খোদ বড় বাবুই বলেছেন। পথে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি ভেবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? উনি বেশ জোর দিয়েই জবাব দিলেন, 'কেন, তোমার জন্যই, তা-ও বোঝনি?' তাঁর ভাবখানা এই যে— কথাসাহিত্যের আমি অন্যতম সম্পাদক সেখানে অবধূতের মরুতীর্থ হিংলাজ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হবে, এতে আর সন্দেহ কী।'[১৭] কার্যত গজেন্দ্রকুমার মিত্রের আপত্তিতে মরুতীর্থ হিংলাজ কথাসাহিত্য পত্রিকায় স্থান পায়নি। গৌরীবাবুর চেষ্টায় মরুতীর্থ হিংলাজ তরুণের স্বপ্ন নামক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল তুলিকলম থেকে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে।

অবধূতের রুদ্রচন্ডী মঠ তথা বসত-বাড়ি বিক্রি করার প্রস্তাব খারিজ হয়ে গেল। স্বভাবতই তাঁরা এই মঠে থেকেই সাধন-ভজন করতে থাকলেন। পুস্তকাদি প্রকাশের প্রচেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা দুজনে প্রায়শ কোলকাতা কালীঘাট যাতায়াত শুরু করলেন। পয়লা বৈশাখে তো তাঁরা অবশ্যই কালীঘাটে উপস্থিত থাকতেন। এরকমের এক শুভদিনে এক ভদ্রমহিলা অবধূতকে দেখে যেন চিনতে পারেন এবং তাঁকে দুলাদা বলে সম্বোধনও করেন। দুলালদার কিন্তু কোনও বিকার লক্ষ করা যায় না। তিনি সরাসরি তাঁদের পরিচয়কে অস্বীকার করেন। তবে ভৈরবী মা ভদ্রতা হিসেবে কী আর করেন, তাঁদের চুঁচুড়োর রুদ্রচন্ডীমাঠে আহ্বান জানালেন। একদিন ওই ভদ্রমহিলা নিজের ভাই ও ভাই-বৌকে সঙ্গে নিয়ে সত্যি সত্যিই এসে হাজির হলেন রুদ্রচন্ডীমঠে। বলাবাহুল্য অবধূত ও ভৈরবী মা তাঁদের আদর আপ্যায়নে কোনও কসুর রাখলেন না কিন্তু একথাও বলতে ভুললেন না যে তাঁরা তাঁদের মোটেই পূর্ব-পরিচিত নন। ভদ্রমহিলারা বিব্রত বোধ করলেন বটে। তাই প্রায় স্বগতোক্তির মতো বলে ফেললেন, দুলালদার এক ছেলে রয়েছে। তার তো পিতাকে দেখতে ইচ্ছে করে। আমরা অসহায়। তাই খুঁজে বেড়ানো ছাড়া উপায় কী আমাদের, বলুন?

এবার অবধূত আর নিজের পরিচয় গোপন রাখতে পারেন না। ভাবাবেগে অশ্রুসজল চোখে ছেলেকে চোখে দেখার জন্য ব্যকুল হয়ে ওঠেন। তারপরেই নাটকের পরিসমাপ্তি। ভদ্রমহিলা আসলে অবধূতের ন-শ্যালিকা। সে কারণেই কালীঘাটে অবধূতকে দেখে তিনি বলেন ফেলেছিলেন— আরে! দুলালদা না।

মামা-মাসির তরফ থেকে খবর গেল অমলের কাছে। অমল তখন বোম্বেতে একটা বেসরকারি অফিসে কর্মরত। বয়সে যুবক। চরম সত্য না হলে হঠাৎ আজন্ম অপরিচিত কাউকে বাবা বলে মেনে নেওয়া বড়ো কঠিন কাজ, দ্বন্দ্ব চলে মনে মনে। সত্যিই কি তার বাবা বেঁচে আছেন? অমলের কাকা মৃণালবাবু আয়কর বিভাগে চাকরি করতেন। তিনি তখন রয়েছেন পানাগড়ে। সেখানে অমলের ঠাকুরমা প্রভাবতী দেবীও রয়েছেন। অমল পানাগড়ে চিঠি লিখে সরেজমিনে তদন্ত করতে বললেন কাকাকে মৃণালবাবু তাঁর মাকে নিয়ে চুঁচুড়ো গেলেন এবং দাদাকে (অবধূতকে)

চিনে ফেলতে তাঁর আর বাকি রইল না। দাদা, ভাই ও মায়ের মধ্যে পুনর্মিলন ঘটল। চিঠি গেল অমলের কাছে। ওদিক থেকেসরাসরি অবধূতও ডাকযোগে নিজের ফটো সম্বলিত মরুতীর্থ হিংলাজ বইটি পাঠিয়ে দিলেন পুত্রের কাছে। অমল আর স্থির হয়ে বসে থাকতে পারলেন না। চাকরি বাকরি গুটিয়ে ফিরে এলেন চুঁচুড়ো। পিতা-পুত্রে মিলন হল কুড়ি-একুশ বছর পরে। অমলকে কোলের শিশু রেখে অবধূত ওরফে দুলাল নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে আর দেখা হল মোটামুটি ইংরেজির ১৯৫৩ কিংবা ১৯৫৪ সালে।

অবধূত কালীঘাট যাতায়াত শুরু করেছিলেন বলেনই বোধহয় পুত্রের সঙ্গে পুনর্মিলন ঘটার সূত্রপাত হয়। ওদিকে অবধূত রচিত কালিতীর্থ কালীঘাট পুস্তকে কালীযন্ত্র গচ্ছিত রাখা, হস্তান্তর হয়ে যাওয়াও শেষে ফিরে পাওয়ার প্রসঙ্গ আচে। তাই কালিতীর্থ কালীঘাট উপন্যাসটিকে অনেকে অবধূতের পিতৃত্বের আকুলতা বলে ধরে থাকেন ওই উপন্যাসে প্রচ্ছন্ন রয়েছে পুত্রকে ছেড়ে অবধূতের গৃহত্যাগ, সিদ্ধিলাভ করার আশা ও শেষে পুত্রের সঙ্গে পুনর্মিলিত হওয়ার প্রেক্ষাপট। কালিতীর্থ কালীঘাটের শেষাংশ এরকম— কংসারি হালদার রয়েছেন কালীঘাটের মূল সেবাইত, বনমালী তাঁর সতীর্থ। কুরুর আদেশানুসারে, বারো বছর শুদ্ধাচারে অজ্ঞাতবাসে থাকলে সিদ্ধিলাভ করা যায়, এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে বনমালী স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও সংসার ত্যাগ করে অজ্ঞাতবাসে চলে যান আর কংসারি থেকে যান পীঠদেবীর সেবায়। বহু ঘাত-প্রতিঘাতের পরে উপন্যাসের শেষে বনমালী অবশ্য ফিরে পান তাঁর সব কিছুই। পুত্র-কন্যা ও পরিজনকে ফিরে পেয়ে বনমালী উপলব্ধি করেন, কালীযন্ত্র, মহাকালিকা, মহপীঠ, শক্তি সাধনা সবই মিথ্যা। সবই মায়া। আসল সত্য হল সন্তান। চিরন্তন হল স্নেহ-প্রেম। আসল ঈশ্বর হল ভালোবাসা। কাহিনির বনমালীর মতো দুলাল ওরফে অবধূতও বাস্তবে ফিরে পেয়েছিলেন তাঁর একমাত্র সন্তান অমলকে। সাযুজ্য বোধহয় এখানেই।

পুত্র অমল ফিরে আসার পর চুঁচড়োর রুদ্রমঠ আশ্রমে থাকার লোক হলেন তিনজন; অবধূত, ভৈরবী মা ও অমল। ভৈরবী মার পোষ্য বলতে কয়েকটি কুকুর আর গাদাগুচ্ছের বেড়াল। পুত্রের মতো তাদের তোয়াজ করা হত। মরুতীর্থ হিংলাজ প্রকাশিত হয়েছে ততদিনে। অবধূত ধীরে ধীরে খ্যাতিমান সাহিত্যিক হয়ে উঠেছেন। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে মরুতীর্থ হিংলাজ চলচ্চিত্রায়িত হল।[২০] অবধূত জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছে গেলেন। এদিকে অমল একটি বই-এর দোকান খুলেছেন ততদিনে রাসবিহারী মোড় থেকে টালিগঞ্জমুখী রেল ব্রিজের নিচে ডানদিকে।[৯(ক)]

এভাবেই চলছিল সংসার, বেশ সুখে শান্তিতেই। কিন্তু সংবেদনশীল ও অভিমানী অবধূত বাধিয়ে ফেললেন আরেক বিভ্রাট। পুত্রের সঙ্গে ছোট্ট কারণে মতবিরোধ হল। অমল রুদ্রচণ্ডীমাঠ ত্যাগ করে অন্যত্র বাস করতে শুরু করলেন।[১৪] দুজনের মধ্যে পাঁচ শো তেষট্টি দিন বাক্যালাপ বন্ধ থাকে। অবশ্য প্রতিটি দিন পিতা অবধূত যে-যন্ত্রণা ভোগ করতেন তার নজির রেখে যান ডায়েরির পাতায় পাতায়।[১৬]

বেপরোয়া দিলদরদি স্বভাব ও অপরিণাম-দর্শিতার কারণে তাঁকে অন্যত্রও অসুবিধের মধ্যে পড়তে হয়েছে। তাঁর বাড়ির ওপারেই নৈহাটিতে সমরেশ বসুর বাড়ি ছিল। তিনি প্রায়শ নৌকাযোগে সেখানে গিয়ে পৌঁছতেন ও গভীর রাত পর্যন্ত আড্ডা দিতেন। শোনা যায় একবার তিনি সেখানে চা পরিবেশনরতা এক সুন্দরী কিশোরীকে দেখে স্বভাবসিদ্ধ ঠাট্টায় ছলে এমন এক সরস মন্তব্য করে বসেন যে তা নিয়েই দুই বন্ধুর মধ্যে মনোমালিন্য শুরু হয়ে যায় এবং সেকথা তারাশঙ্করের কাছ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তিনিও ভুল বোঝেন এবং অবধূতের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্কের অবদানকে কোনও দিনই অস্বীকার করতেন না। তাঁকে সাহিত্য-জীবনের গুরু বলেই মান্য করতেন সারা জীবন।

তারাশঙ্করের প্রচেষ্টাতেই অবধূতের প্রথম উপন্যাস মরুতীর্থ হিংলাজ প্রকাশিত হয় এবং পাঠক সমাজে বইটি আলোড়ন তোলে। তারপর তাঁর লেখা একের পর এক বই প্রকাশ পেতে থাকে, প্রকাশকের আর অভাব হয় না। সজনীকান্ত দাসের মতো প্রখ্যাত সমালোচকও তাঁর লেখা উদ্ধারণপুরের ঘাট উপন্যাসের ভূমিকা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে লিখে দেন। প্রকাশকদের মধ্যে প্রথম দিকের বইগুলির প্রথম সংস্করলণ প্রকাশ করেন তুলি কলম। ক্রমে আরও অনেকে এগিয়ে আসেন যেমন কানাইবাবুর ত্রিবেনী প্রকাশনী, দেবশ্রী সাহিত্য সমিতি, এসোশিয়েটেড পাবলিসার্শ, জ্যোতি প্রকাশন, ন্যাশনাল পাবলিশার্স, মিত্রালয়, গুপ্ত প্রকাশিত ইত্যাদি। সব শেষে খ্যাতনামা প্রকাশক মিত্র-ঘোষ। অন্যদিকে বহু সাহিত্যিকের সঙ্গে অবধূতের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সাহিত্য আড্ডাও জমতে থাকে। যেমন— প্রমথনাথ বিশী, সৈয়দ মুজতবা আলি, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, সুশীল জানা, তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী প্রমুখ প্রায়শ অবধূতের রুদ্রচণ্ডী মঠে আসতে শুরু করেন। ওদিকে সৈয়দ মুজত বা আলি তো ছিলেন আরেক দিলদরিয়া মানুষ তিনি পাশের গঙ্গা- ঘাটে উচ্চৈঃস্বরে সংস্কৃত শ্লোক আওড়াতে আওড়াতে স্নান করতেন, থেকেও যেতেন কয়েক দিন। সাহিত্য আড্ডা জমত ভালো। কালীঘাটে তারাপ্রণব ব্রহ্মচারীর বাড়িতে গিয়েও সাহিত্য তথা তন্ত্র-সাধনার আড্ডা বসত। টালা পার্কে তারাশঙ্কর বাবুর বাড়িতে তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে বহু সাহিত্যিকের সমাবেশ হত।[২১] বলা বাহুল্য তার অন্যতম ছিলেন অবধূত। সেখানেও আড্ডা রয়্যালটির টাকা পয়সা ভালোই আসছিল তখন। এমনিতেই অবধূত পরিবার ছিলেন অতিথি বৎসল। তার উপরে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে এসেছে অতএব অতিথি আপ্যায়নের আড়ম্বরও একই তালে বেড়ে চলেছে।

শঙ্কু মহারাজ (কমলকুমার গুহ) তখন খ্যাতনামা লেখক হননি। তাঁর লেখা ছাপানোর জন্য মিত্র-ঘোষের প্রকাশক গজেন মিত্তির তাঁকে কয়েকজন খ্যাতনামা লেখকের শংসাপত্র সংগ্রহ করতে পরামর্শ দেন। সে তালিকার প্রথম দিকেই ছিল অবধূতের নাম। অনেক সঙ্কোচের পর শঙ্কু মহারাজ অবধূতের রক্তচণ্ডী মঠের দ্বারে পৌঁছন। ....তিনি আমদের নিয়ে গেলেন তাঁর শোবার ঘরে। অপরিচিতের গণ্ডি একেবারেই মুছে গেল। ...বৌদি চা জলখাবার দিয়ে গেলেন। দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা চলল। ফলে আবার এল চা। প্রচন্ড অতিথি বৎসল ছিলেন ওঁরা দুজনেই।... কতদিন গেছি হিসেব রাখিনি। একদিন তো রীতিমতো নেমন্তন্ন করে বিরাট ভোজ দিয়েছিলেন।...ভানুবাবু (মিত্র ও ঘোষের বর্তমান কর্ণধার সাবিতেন্দ্র নাথ রায়) তখন প্রুফ নিয়ে নিয়মিত যেতেন তাঁর কাছে। সারাদিনের প্রোগ্রাম। অবধূত প্রুফ দেখতেন আর ভানুবাবু বসে থাকতেন।...সেখানেই দ্বিপ্রাহরিক আহার সেরে প্রুফ সমেত ফিরতেন সন্ধ্যার মধ্যে...।[২২] শঙ্কু মহারাজকে অবধূত খুবই ভালোবাসতেন। অবধূত তাঁকে মরু ভ্রমণে এতটাই উৎসাহিত করেন যে শঙ্কুমহারাজ অন্তত চারবার থর মরুভূমি ভ্রমণ করেন।

কীর্ণাহারের রামশম্ভুবাবু ডায়েরি থেকেও অবধূত দম্পতির অতিথি পরায়ণতার বহু নজির পাওয়া যায়। মৃত্যুর বছর তিনেক আগেও তাঁর আপ্যায়নের বাহুল্য পূর্ববৎ বজায় ছিল। ২৫/১০/১৯৭৫ তারিখে ডাকে দেওয়া এক ছাপা পোস্টকার্ড পাওয়া যায় রামশম্ভুবাবুর বাড়িতে।

সেখানে দেখা যায়, ১৬ কার্তিক ১৩৮২ খ্রিস্টাব্দে দীপান্বিতা অমাবস্যায় মায়ের মহাপূজা এবং শ্রীশ্রীবটুক নাথের বিশেষ হোম হবে। পরদিন ভোরে অবধূতজির শুভ জন্ম তিথি উৎসব। সে-উপলক্ষ্যে সকলকে আহ্বান জানানো হয়েছে। বলা বাহুল্য এরকমের ছাপা চিঠি অনেকেই পেয়েছেন, শিষ্য-শিষ্যারা তো বটেই। জীবনের শেষের দিকে তিনি প্রচুর মানুষকে দীক্ষা দিয়েছিলেন তন্ত্রমতে। খ্যাতনামা গোয়েন্দাগল্প লেখক ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। ব্যাপাকপুরেও তাঁর প্রচুর শিষ্য ছিল। কাজেই খরচ-পত্রাদির বহর সহজেই অনুমান করা যায়। ওই অনুষ্ঠানে রামশম্ভুবাবু উপস্থিত হয়ে তন্ত্র-ধারকের ভূমিকা পালন করতেন। কয়েক দিন তিনি সপুত্র ওখানে থেকেও যেতেন। এরকম পরিস্থিতিতে আরও অনেকেই রুদ্র চণ্ডী মার আশ্রমে কয়েকটা দিন কাটাতে বাধ্য হতেন, সন্দেহ নেই। খরচও হত সেরকম।

অমলের বিয়ে হয়েছে একটু বেশি বয়সেই। পিতা অবধূত পাত্রীর খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। একটি ভালো পাত্রী দেখে বিয়ে দিতে হবে। হাজির হন নদিয়া জেলার বেথুয়াডহরি গ্রামে। কন্যার নাম সুচনা, বেথুয়াডহরি হল তার দিদির বাড়ি, আদি বাড়ি ঢাকা। তাঁকে দেখেই অবধূত স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলে ফেলেন— এ বেটি আমার বাড়ি যাবেই। মহা সমারোহে অমল সুচনার বিয়ে হয়ে যায় ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে। এখনও সুচনা দেবী গৌরবের সঙ্গে সে-দিনের কথা স্মরণ করতে পারেন— বাবা মানুষের মুখ দেখেই ভবিষ্যবাণী করতে পারতেন। তাঁর চোখ বন বন করে ঘুরত। শ্বশুর বৌমা সম্পর্ক বেশ মধুর ছিল। অনেক সময় গল্প প্রকাশ করার আগেই বৌমাকে তিনি পড়ে শোনাতেন। যেমন—দধীচি গল্পটি শারদীয়া নবকল্লোলে প্রকাশের আগেই অবধূত স্বয়ং সুচনাদেবীকে ওটি পড়ে শুনিয়েছিলেন। হিংলাজের পবিত্র গুহার অভ্যন্তরে যে-স্বর্গীয় জ্যোতিঃদর্শন করার সৌভাগ্য অবধূতের হয়েছিল, সে-কথা একমাত্র সুচনাদেবীকেই বলেছিলেন এবং সুচনাদেবী সে-কথা শুনতে শুনতে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতেন। অদ্ভুত এক অনুভূতিতে দেহ-মন ভরে যেত।[১৬] বৌমার অসুখের খবর পেয়ে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে ছেলে ও বৌমাকে পৃথক পৃথক যে-দুটি চিঠি দিয়েছিলেন সে চিঠি দুটি সুচনাদেবী এখনও রক্ষা করে চলেছেন। অবধূতের লেখা তাঁদের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্রখানি সেকালের সাপেক্ষে যথেষ্ট অভিনবই ছিল। পত্রে পাত্রপাত্রীর উর্ধ্বতন তিন পুরুষের নাম ও পরিচয় লেখা ছিল। আজকাল এই ধরনের নিমন্ত্রণ - পত্র প্রায়শ চোখে পড়লেও ত্রিশ চল্লিশ বছর আগে এরকম কার্ডের কথা কেউ চিন্তাও করত না।[১৭]

চুঁচুড়োতে আশ্রম করে আপাত থিতু হলেও অবধূত কিন্তু তাঁর যাযাবর বৃত্তি একেবারেই ত্যাগ করতে পারেননি। সন্ন্যাস জীবনে যেসব জায়গায় তিনি কাটিয়েছেন সেসব জায়গাগুলিতে প্রায়শ চলে যেতেন। পরিচিতদের সঙ্গে কিছুদিন কাটিয়ে আবার পা বাড়াতেন নতুনের সন্ধানে। যেমন, একসময় ছিলেন কীর্ণাহারে। চুঁচুড়োতে বাড়ি করার পরেও তিনি তাই কীর্ণাহারে গেছেন অন্তত চার পাঁচ বার। কোনও এক কালীপুজোর সময় অবধূত কীর্ণাহারে আসেন এবং রামশম্ভুবাবুর বাড়ির পাশে শ্রীদাম মন্ডলের মাটকোঠা ফাঁকা বাড়িতে প্রায় মাস খানেক থেকে যান। চুঁচুড়োতে বাড়ি করার পরে পরেই উদ্ধারণপুরের ঘাট উপন্যাসটি লিখতে শুরু করেন কিন্তু সেটি শেষ হয় কীর্ণাহারের ওই মাটকোঠা বাড়িতেই। সেবারই শান্তিনিকেতন থেকে অনিল চন্দ্র এসে অবধূতের সঙ্গে দেখা করে যান।

অবধূত জজানে ছিলেন কয়েক বছর। কুড়ি বছর পরেও তিনি সেকথা বুলতে পারেননি। সেখানেও গেছেন তিনি অন্তত একবার। তা-ছাড়া একটি চিঠিতে দেকা যায় তাঁর অস্থায়ী ঠিকানা হচ্ছে— অবধূতঃ হিংলাজ আশ্রমঃ চন্ডীপুর ঃ তারাপীঠ ঃ বীরভূম ঃ প্রযত্নে অনিল মুখোপাধ্যায় (বাবলু), আশ্রম সম্পাদক। অর্থাৎ সেখানে গিয়েও তিনি প্রায়শ থাকতেন। এভাবেই যাযাবর বৃত্তি চালিয়ে গেছেন প্রায় সারাটা জীবন।

আবার চুঁচুড়োতে যখন থাকতেন তখন রুদ্রচণ্ডী আশ্রম হয়ে উঠত এক আনন্দাশ্রম। সুচনা দেবীর কথায় সে-চিত্রটা আরও পরিষ্কার হয়ে দেখা দেয়।...খেতে খুবই ভালো বাসতেন তিনি। কিন্তু তার চেয়ে বেশি ভালো বাসতেন খাওয়াতে। বাড়িতে যে অতিথি আসত, তাকে না-খাইয়ে কিছুতেই ছাড়তেন না। নিজে রান্নাও করতে পারতেন খুব ভালো। বিশেষ করে মাংস। হিং দেওয়া অড়হর ডাল। মাংসের বিভিন্ন রকম পদ রান্না তো ওনার কাছ থেকেই আমার শেখা। তবে নিজে সবথেকে বেশি পছন্দকরতেন মিষ্টি। আমরা ঢাকার মানুষ। আমার তৈরি পিঠে পায়েস খেতেন খুবই তৃপ্তি করে। অবশ্য আকন্ঠ প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে একথাও শুনতে হয়— মিষ্টিটা একটু কম হয়ে গেছে বৌমা...।[১৬]

অবধূত তাঁর সিংহভাগ লেখাই চুঁচুড়োর বাড়িতে বসে সমাধা করেছেন। সাধারণত সকালে সামনে একটি নিচু কাচের টেবিলে কাগজ রেখে তিনি লিখতেন এবং মাঝে মধ্যে উঠে গিয়ে ঘরের দক্ষিণ দিকের ছোট্ট জানালার ধারে দাঁড়াতেন। তখন তাঁর মুখের দিকে তাকালে মনে হত, তিনি যেন গভীর ভাবে কিছু চিন্তা করছেন। চারদিকে কোলাহল। লোকজন কিছুর দিকেই তাঁর দৃষ্টি নেই। একান্ত তন্ময় হয়ে যেন নিজের মধ্যেই নিজে ডুবে রয়েছেন। খানিকটা চিন্তার পর বসে খস্ খস্ করে লিখে যেতেন পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা। এমনটাই ছিল তাঁর লেখার পদ্ধতি।

তখন তাঁর স্বর্ণযুগ চলছে। একটার পর একটা বই প্রকাশিত হয়ে চলেছে। বাংলায় তখন অবধূতকে চেনেন না, এমন কেউ নেই। একবার একটা মজা হয়েছে। বেবি ফুডের আকাল। ছোটো নাতি সংকর্ষণের জন্য বেবিফুড পাওয়া যাচ্ছে না। বৌমা সুচনাদেবী কথাট শ্বশুরমশাই-এর কানে তুলতেই তিনি ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ফোন করেন ডি.আই.জি -কে। অদ্ভুত ব্যাপার। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্থানীয় থানার দারোগা তটস্থ হয়ে স্বয়ং এসে চারটি আমুলের কৌটো পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

সুখের দিন অবধূতের জীবনে স্থায়ী হয়নি। তাঁর বই প্রকাশিত হয়, বিভিন্ন পত্রিকায় ছোটো গল্প প্রকাশেরও খামতি থাকে না। কিন্তু টাকা-পয়সা আসে না। একসময় আয় ছিল মোটামুটি মাসিক বারো শো টাকা। তা কমে দাঁড়ায় সাতশোতে। প্রকাশকেরা ফাঁকি দিতে থাকেন। পত্রিকা অফিস থেকে দক্ষিণ আসাটা ক্রমশ কমতে থাকে। এমনকী তাঁর গল্প প্রকাশ হলে সৌজন্য-কপিও লেখকের কাছে পৌঁছায় না। ওদিকে কোনও শীর্ষ স্থানীয় পত্রিকা গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর মতভেদ ঘটে। শোনা যায়, তিনি রবীন্দ্র পুরস্কারের জন্য মনোনীত হলেও অজ্ঞাত কারণে তাঁর নাম বাতিলের খাতায় ওঠে। বাংলা সাহিত্যের সেরা পঞ্চাশটি উপন্যাসের তালিকাতেও মরুতীর্থ হিংলাজ কিংবা উদ্ধারণপুরের ঘাটের মতো উপন্যাস কোনও ঠাঁই পায় না।

ওদিকে সংসারের খরচ বেড়ে চলে। ভৈরবী মা অসুস্থ হন। চিকিৎসার খরচ বাড়ে। ক্রমশ বাড়ির কাজকর্ম করার জন্য লোকজন রাখতে হয়। তাদের মাইনে আছে। অবধূত দম্পতির মনের প্রসারতা তো মনে না। কাজেই লোকজনদের দুঃখ-কষ্টের কথা শুনে তাদের সাহায্য করার

জন্য এগিয়ে আসেন। একজন ঝি রাখতে হয়। রাখতে হয় এক রাঁধুনিকে। তার আবার স্বামী পরিত্যক্তা একটি কন্যা। সে-ই বা যায় কোথায়। কাজেই সেও ওই সংসারেই থাকে। সদস্য সংখ্যা বেড়ে যায় কিন্তু আয় যায় কমে। তার উপর বহুকাল বাহিত মদ্যপানের অভ্যেস তো আছেই। হতাশার কারণে তাও বাড়ে। অর্থাৎ অবদূতের সংসার তখন অর্থ সংকটে মুহ্যমান। উপায় একমাত্র অপরিশোধ্য ঋণ। এরকম অবস্থার মধ্যেই ১৩৮৪ বঙ্গাব্দের ৩২ শ্রাবণ (১৭ আগস্ট ১৯৭৭ বুধবার সকাল) ভৈরবী মাতার মহা প্রয়াণ ঘটে। শ্রাদ্ধ-শান্তি আদিতে আপনজনদের উদ্দেশ্যে লেখা ছাপা আমন্ত্রণ পত্র থেকে জানা যায় তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়াদি করেন পুত্র অমল। ভৈরবী মাতার মৃত্যুর পর অবধূত খুবই ভেঙে পড়েন। শরীর যেমন খারাপ হতে থাকে তেমনি মানসিক দিক থেকে তিনি একাকিত্বে ভুগতে থাকেন। সাত আট মাসের মধ্যেই ৩০ চৈত্র ১৩৮৪ (১৩ এপ্রিল ১৯৭৮) বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে অবধূতেরও মহাপ্রয়াণ ঘটে। তৎকালিন পত্র-পত্রিকায় তাঁর প্রয়াণের খবর প্রকাশিত হয়। রামশম্ভুবাবুর ডায়েরির পৃষ্ঠায় সে-প্রসঙ্গে লেখা আছে—গতকল্য ১৩/০৪/৭৮ তারিখে ১৩৮৪। ৩০শে চৈত্র বৃহস্পতি বার বৈকাল ৩.৩০ মিনিটে চুঁচুড়ার জোড়াঘাটে তাঁর রুদ্রচন্ডী আশ্রমে পরলোক গমন করেন। (যুগান্তর বার্তা)। আনন্দবাজার ছেপেছে - চুঁচুড়া হাসপাতলে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

তাঁর মৃত্যুর পর জানা যায় তিনি উইল করে জ্যেষ্ঠ পৌত্র তারাশঙ্করের নামে বসত-বাড়ি ও মরুতীর্থ হিংলাজ ছাড়া সবকটি বই-এর গ্রন্থস্বত্ব লিখে দিয়ে গেছেন। মরুতীর্থ হিংলাজের গ্রন্থস্বত্ব দিয়েছেন পুত্রবধূ সূচনাদেবীকে। পুত্র ও ছোটো নাতির নামে কিছু দেননি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

রামানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়, রামপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায় ও অরুণ রায় (কীর্ণাহার) সুশান্ত মণ্ডল (দাঁইহাট), তারাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় সূচনাদেবী, ড.দিলীপ সিংহও ডাঃ অক্ষয় আঢ্য (চুঁচুড়া), অজয় আচার্য (প্রকাশক) ড. বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (চন্দননগর), সুনন্দ ভৌমিক (মানকুণ্ডু), ড.রঞ্জন কান্তি জানা (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়), লক্ষ্মীজনার্দন ঘোষ ও জয়ন্তীদেবী (জজান), নীলকমল আচার্য (কান্দি) নবনীগোপাল মুখোপাধ্যায় (জিউই), গৌরদাস বৈরাগ্য (মুণ্ডমালিনীতলা), রতন দাস (উদ্ধারণপুর), অমিয় চট্টোপাধ্যায় (পুজারি জিউই কালীবাড়ি) প্রমুখ।

তথ্য সংকেত ঃ-

১। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তঃ পঞ্চম প্রকাশ, ভাদ্র ১৩৭৩ পৃ ৩৪৩

২। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বঙ্গসাহিত্য উপন্যাসের ধারা ঃ ১৩৭২ বঙ্গাব্দঃ পৃ ৭৮৬, ৭৮৯-৯৫।... লেখক আশ্চর্যরূপ সার্থক রূপক ব্যঞ্জনায়, উপাদান বিন্যাসে অদ্ভুত কুশলতা... চতুর্দিকে হিল্লোলিত কামনা-তরঙ্গভঙ্গের চঞ্চল ছন্দে প্রতিবেশের স্থূল বাস্তবতা ও সূক্ষ্ম ভাবসঙ্কেতের সাহায্যে ইহাকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম... শ্মশানের মহাকাব্য রচিত হইয়াছে।

২। (ক) সজনীকান্ত দাশ ঃ ভূমিকা ঃ উদ্ধারণপুরের ঘাটঃ... মরুতীর্থ হিংলাজ পড়িয়া বাংলা সালিত্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নবাগত অবধূতের পাকাপোক্ত হাতের এবং অনাসক্ত ও নির্লিপ্ত মনের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম।... তাঁহার বহু বিচিত্র জীবন হইতে তিনি এতকাল অভিজ্ঞতার যে রস ও রসদ সংগ্রহ করিয়াছেন তাঁহা তাঁহার চিত্তকে পুলিশকঠিন করে নাই। তিনি আষাঢ়ের নবীন মেঘের মত বর্ষণোন্মুখ হইয়া আছেন।... হঠাৎ উদ্ধারণপুরের ঘাটের পাণ্ডুলিপি হাতে পাইলাম। এক নিঃশ্বাসে পড়িয়াই সন্দেহের নিরসন হইল। সকল মানুষের যাহা চরম পরিণতি— কালো কয়লা এবং সাদা হাড়— অনির্বাণ চিতা বহ্নিতে যেখানে অহরহ সেই পরিণামের ভিয়ান চলিতেছে, সেই উদ্ধারণপুরের ঘাটে শবপরিত্যক্ত বিচিত্র শয্যার গদির উপর আসীন হইয়া তরল আগুন গিলিতে গিলিতে তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া সাঁইবাবা না বনিলে যে মরুতীর্থ হিংলাজের স্বামীজী মহারাজ হওয়া যায় না তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম এবং অপরিসীম আনন্দলাভ করিলাম। এই আনন্দ সকল পাঠক পাইবেন সেই আশাতেই এই ভূমিকা লেখার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় স্বীকার করিলাম।

৩। লেখা অবধূতের আদি বাড়ি ছিল বরিশালে। কিন্তু চুঁচুড়া অধিবাসী অবধূতের পুত্রবধু ও পৌত্রদের বয়ান অনুসারে জানা যায়, তাঁদের বাড়ি ছিল উত্তর কোলকাতার কোথাও, সম্ভবত হাতিবাগানে। রামশম্ভুবাবুর লেখায় ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির কাছে, জন্মসাল ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ। আবার সংসদ বাঙালি চরিত্রাভিধান ও বঙ্গ সাহিত্যাভিধান (হংসনারায়ণ) অনুসারে জন্ম ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে ভবানীপুর, কোলকাতায়। অবধূতের অন্যতম শিষ্য সুলেখক ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় মে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে প্রসাদ পত্রিকায় লিখেছেন— অবধূতের পূর্বাশ্রমের নাম দুলাল মুখোপাধ্যায়। সিলেটের লোক।

কোথায় সিলেটে আর কোথায় বরিশাল! নানা বক্তব্যের গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েও মনে হয়, অবধূতের আদি বাড়ি নিঃসন্দেহে ছিল বর্তমান কালের বাংলা দেশের বরিশালে। পরে তিনি কোলকাতায় ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় ভাড়া থেকেছেন বলে এ-রকমের বিভ্রান্তি। অবশ্য সবই অনুমান, লিখিত দলিল কিছু নেই। ওদিকে জন্ম - সাল নিয়েও গন্ডগোল কম নেই। তাঁর পুত্রবধূ সূচনাদেবী, বড়ো নাতি সংকর্ষণ ও ছোটো নাতি তারাশঙ্করের মতানুসারে দুলালচন্দ্রের জন্মসাল ১৯১০-ই।

৪। সঠিক সন, তারিখ বা বার জানা যায়নি। তবে জন্মদিন যে কালীপুজোর পরের দিন সে-সংবাদটি যথার্থ। কেন-না সেটা পাওয়া গেছে। রামশম্ভুবাবুকে লেখা ভৈরবীমার এক ছাপানো চিঠি থেকে। ২৫.১০.৭৫ তারিখে পোস্ট করা চিঠির অংশ বিশেষ— 'আগামী ১৬ কার্তিক ইংরেজি ২রা নভেম্বর ররিবার ৯। ৪৮ থেকে অমাবস্যা। দীপান্বিতা অমাবস্যায় মায়ের মহাপূজা এবং বটুকনাথের বিশেষ হোম পরদিন ভোরে অবধূতজীর শুভ জন্মলগ্ন...

জোড়া ঘাট ভৈরবী মা

চুচড়ো ৩রা কার্তিক সোমবার ১৩৮২

৫। কীর্ণাহার স্কুলের তৎকালিন প্রধান শিক্ষক রামশম্ভু গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে অবধূতের যোগাযোগ ছিল সুদীর্ঘকাল। সে-সুত্রে রামশম্ভুবাবুর ডায়েরি থেকে অনেক কথাই জানা যায়। (অন্যত্রও বিস্তারিত বর্ণনা আছে।) অবধূত লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাঁর শত্রু বেড়ে যায়। যৌবনে তাঁর গৃহত্যাগের কারণ হিসেবে তাই নানা রকমের গুজব ছড়ায়। কেউ কেউ বলেন অফিসের বড়ো কর্তার সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হয়।

তহবিল তছরুপের দায়ে তাঁকে মিথ্যে অভিযুক্ত করা হয়। তাঁর নামে পুলিশ কেশ রুজু হয়ে যায় এবং তিনি পুলিশের ভয়েই গৃহত্যাগ করেন। সে-জন্যই তিনি ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় দিতেন। মূল প্রবন্ধে প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছে।

রামশম্ভুবাবু তাঁর নিকট-বন্ধু ছিলেন, তাঁর লেখার গৃহত্যাগের কারণ হিসেবে স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগের উপরেই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। আমাদের মতে তাঁর লেখাটিই বেশি প্রামাণ্য।

৬। সংকর্ষণ মুখোপাধ্যায় (কালিকানন্দ অবধূতের পৌত্র) ঃ জাগরণ ঃ পঞ্চম বর্ষ ১৪১০ ঃ সম্পাদক - অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়

৭। বর্তমানে সারা উদ্ধারণপুর সরেজমিনে তদন্ত করে এমন কোনও বয়স প্রত্যক্ষদর্শীর সন্ধান পাওয়া যায়নি যিনি অবধূতকে মহাশ্মশানে গদি পেতে বসে থাকতে দেখেছেন। অবশ্য একথা ঠিক যে তিনি তখন ছিলেন পূর্ণ যুবক এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসী মাত্র, স্বনামখ্যাত লেখক মোটেই নন। তা-ছাড়া উদ্ধারণপুরের বর্তমান অধিবাসীদের সিংহভাগ হলেন পূর্ব বাংলার লোক। তাঁরা প্রায় সকলেই অবধূতের লেখা উদ্ধারণপুরের ঘাট বইটি পড়েছেন এবং অজান্তেই অবধূতের দেওয়া উদ্ধারণপুরের তৎকালিক পরিবেশ প্রায় মুখস্থ করে রেখেছেন। জিজ্ঞাসা করলেই ওই কথাকটি তাঁরা গর্গর্ করে বলে যেতে থাকেন যেন অবধূতের ক্রিয়াকলাপ তাঁর স্বচক্ষেই দেখেছেন। ওদিকে সাহিত্যিক সুশীল জানার উত্তর সূরি ড. রঞ্জন কান্তি জানা বলেন— তাঁর বাবার সঙ্গে অবধূতের গভীর বন্ধুত্ব ছিল। বাবা বলতেন উদ্ধারণপুরের থাকা - কালীন অবধূত কেতুগ্রামে বহুলা সতীপীঠে প্রায়শ সাধনার জন্য যেতেন। এক সাক্ষাৎকারে জানা যায়, বল্লপীঠে থাকাকালীন কেতুগ্রামে এক সংস্কৃতি প্রেমী নবীন শিক্ষক রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের (বর্তমানে ৯৩ বছর বয়সী) সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ ওঠে। অবধূত প্রায়ই ক্ষীরগ্রামে যোগদ্যা মন্দিরে আসতেন এবং সে সুত্রে ওখানকার অনিলকৃষ্ণ চৌধুরির সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়।

জাগরণ (১৮০৯ বাংলা) পত্রিকায় শান্তনু চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন— 'শ্রদ্ধেয় কমলকুমার গুহ (শঙ্কুমহারাজ) এই নিবন্ধকের সঙ্গে বছর দুযেক আগে শ্মশান ঘাটে গিয়েছিলেন। তিনি বিস্ময়ে হতবাক। জানলাম তিনি যখন তরুণ, তখন অবধূতের সঙ্গে এই শ্মশানঘাট দেখতে এসে রীতিমতো ভয় পেয়েছিলেন।...' তা-থেকে মনে হচ্ছে, অবধূত যখন নামকরা সাহিত্যিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন তখন তিনি দ্বিতীয়বার এসেছিলেন উদ্ধারণপুরের। সঙ্গে ছিল শঙ্কুমহারাজ। তখনও উদ্ধারণপুরের শ্মশান ভয়ঙ্কর ছিল।

৮। ড. কালী চরণ দাস প্রমুখ ঃ শুধু দুই পা ফেলিয়া

৯। চরণের মৃত্যুর পরেও দীর্ঘকাল বেঁচে ছিল নিতাই বোষ্টমি। কোনও প্রসঙ্গে অবধূতের কথা উঠলেই দু'চোখের পাতা অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠত তাঁর। হাত দুটো অজ্ঞাতসারেই স্পর্শ করত ললাট। রামশম্ভুবাবুর ছেলে রামানন্দ গঙ্গোপাধ্যায় স্মরণে রেখেছেন— উদ্ধারণপুরের ঘাটের নায়িকা নিতাই বোষ্টমিকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় মহাজাতি সদনে। সে-সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল কোলকাতার স্বনাম খ্যাত জমিদার লাটুবাবু ও ছাতুবাবুর স্মরণে, পরিচালনায় ছিলেন শিল্পী সংসদ। তারিখ ছিল ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর। রামশম্ভুবাবুর ছেলে রামানন্দবাবুর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানেন—সে সংবর্ধনা সভায় বাবার সঙ্গে তিনিও উপস্থিত ছিলেন।

৯ (ক)। প্রসঙ্গান্তরে তিনি বলেন, বাবার সঙ্গে তিনি অমলের বই-এর দোকানে একবার গেছিলেন। অবধূত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তিনি যখন স্কুল ফাইনাল পরিক্ষার্থী ছিলেন তখন তাঁর হাত দেখে অবধূত বলেছিলেন—তুই বৃত্তি পাবি। দেখা যায় তিনি সত্যিই বৃত্তি পেয়েছিলেন।

১০। অবধূতের পুত্রবধূ বা পৌত্রেরা মনে করেন অবধূতের প্রথম বিয়ে হয় অমলের মা সুখময়ীর সঙ্গে। সুখময়ী মারা গেলে পুলিশের ভয়ে অবধূত গৃহত্যাগ করেন এবং বরিশালে কোনও গৃহস্থ বাড়িতে কিছুকাল আত্মগোপন করে থাকার আবেদন জানান। সে-বাড়িতে সরোজিনী নামে এক অরক্ষণীয়া কন্যা থাকার কারণে তাঁকে থাকতে দিতে তাঁরা নারাজ হন। তিনি যদি সরোজিনীকে বিয়ে করেন তবে কোনও মতে স্থান হবে বলে এক শর্তের প্রসঙ্গ ওঠে। অবধূত বলেন, তিনি তো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, পূর্ণ সন্ন্যাস-জীবন যাপন করবেন, কাজেই কী করে বিয়ে করেন! পাশের ঘর থেকে সরোজিনী আর স্থির হয়ে বসে থাকতে পারেন না। মুখ ফুটে বলেই ফেলেন, তিনিও সন্ন্যাসিনী হতে প্রস্তুত আছেন। দুজনেই ওই একই শর্তে রাজি হয়ে যান এবং যথারীতি তাঁদের বিয়েও হয়ে যায়।

সরোজিনী শর্তে খেলাপ করেননি। সারাটা জীবন তিনি অবধূতের সঙ্গেই কাটিয়েছেন। এমনকী মরুতীর্থ হিংলাজ যাত্রার সময়ও তিনি অবধূতের সঙ্গিনী ছিলেন। মরুতীর্থ হিংলাজ গ্রন্থের ভৈরবীই আসলে সরোজিনী।

১১। আগেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে অবধূতের কোনও প্রামাণ্য জীবনী নেই। তাঁর বংশধরেরাও ধারাবাহিক কোনও জীবন কথা শোনাতে পারেন না। তার অবশ্য যথার্থ কারণও আছে। কয়েক মাসের শিশুপুত্রকে রেখে অবধূত গৃহত্যাগ করেন। তারপর থেকে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন থাকে। তাঁর পরিব্রাজক জীবনের কথা কেউ কিছু জানতে পারেন না। পুত্রের সঙ্গে পুনর্মিলন হয় প্রায় বাইশ বছর পরে। কাজেই তিনি নিজে কিছু না-বললে তাঁর অজ্ঞাতবাসের বিবরণ মানুষ জানবে কীকরে। আরও দুঃখের কথা পুলিশের নজর এড়াতে তিনি নিজের জীবন সম্পর্কে এক একজনকে এক এক রকম কথা বলেছেন। তাতে আসল ঢাকা পড়েছে এবং এক ধরনের প্রহেলিকার সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই নানা দিক বিচার বিশ্লেষণ করে আনুমানিক একটা সাল তারিখ নির্ভর জীবন-কথা সমাপ্ত করতে হয়। এ-প্রবন্ধে সেটাই করা হয়েছে।

সৌভাগ্য বশত মুণ্ডমালিনীতলায় তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় কীর্ণাহার স্কুলের প্রধান শিক্ষক রামশম্ভু গঙ্গোপাধ্যায়ের। আমৃত্যু তাঁদের সৌহার্দ্য বজায় ছিল। অবধূত রামশম্ভুবাবুকে মাস্টারমশাই বলে সম্বোধন করতেন এবং তাঁর উদ্দেশে একাঘ্নী নামে একটি গ্রন্থও উৎসর্গ করেন। রামশম্ভুবাবুকে নিজ মুখে তিনি তাঁর অতীত জীবনের কথা কিছু বলেছিলেন। রামশম্ভুবাবু সেকথাগুলি তাঁর ডায়েরির পৃষ্ঠায় লিখে রাখেন। ঘটনাচক্রে তাঁর লেখা ডায়েরির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠা তাঁর সুযোগ্যপুত্র রামপ্রসন্ন ও রামানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়ের বদান্যতায় আমাদের হাতে এসেছে। কাজেই মুণ্ডমালিনীতলা থেকে শুরু করে পরবর্তী কালের বিবরণ অবধূতের প্রহেলিকা-বর্জিত জীবন-কথা বলেই ধরা যায়। কিন্তু সাল-তারিখের গণ্ডগোল যে একেবারেই নেই, সে-কথা জোর দিয়ে বলা যাবে না।

১২। রামশম্ভুবাবুর ছেলে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়র রামমোহনবাবু ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষা দেন। তাঁর কথা মতো পরীক্ষার তিন চার বছর আগে তিনি অবধূতকে মুণ্ডমালিনীতলায় অবস্থান করতে দেখেছেন।

১৩। কাটোয়া - সিউড়ি বাস পথে লাভপুর কীর্ণাহারের মধ্যে মাঝ-মাঠে পড়ে মুণ্ডমালিনীতলা। সেখানে কোনও বাস দাঁড়ায় না। সুদূর অতীতে কৃষ্ণানন্দ গিরি নামে একজন সাধক লাভপুর বা কেতুগ্রাম অট্টহাসের মতো সেখানে শেয়ালদের বশ করেছিলেন ও ডেকে ভোগ দিতেন বলে শোনা যায়। সেকারণে মুণ্ডমালিনীতলাকে অনেকে শিয়ালদহও বলে থাকেন। এই নামটিই অতীতে অধিক প্রচলিত ছিল। কেতুগ্রাম অট্টহাসের মতো বিশাল জঙ্গলাকীর্ণ জায়গা নিয়ে মুন্ডমালিনীতলা। অবধূত সেখানে যে-মন্দিরটি তৈরি করেছিলেন সেটি ছিল অত্যন্ত ছোটো আকারের। পুরোহিতকেও গুঁড়ি মেরে ঢুকতে হত। সেটিকে প্রমাণ আকারের মন্দির তৈরি করা, সামনে অবধূতের তৈরি ছোট্ট নাটমন্দিরটি প্রশস্ত করা, ধ্যানেশ্বর শিবমন্দির তৈরি, সন্ন্যাসী - আবাস নির্মাণ, নলকূপ খনন, শৌচাগার নির্মাণ ইত্যাদি মহৎ কাজগুলি করেছেন সদানন্দ গিরি মহারাজ নামে একজন সাধক (জন্ম ১২ই ফাল্গুন ১৩৩৩ ঃ মৃত্যু ২৬শে আশ্বিন ১৪০৯)। তিনি সেখানে প্রায় বারো বছর অধিষ্ঠান করেছিলেন। বর্তমানে রয়েছেন বিমলানন্দ গিরি নামে এক সন্ন্যাসী। তিনি সদানন্দ গিরি মহারাজের উপবিষ্ট মূর্তি নির্মাণ করেছেন।

মুণ্ডমালিনী তলায় গৌরদাস বৈরাগ্য নামে প্রায় ৬৭ বছরের এক বৈষ্ণবও থাকেন। তাঁর বাড়ি ছিল নিকটের মহেশপুর গ্রামে। তিনি যখন বছর সাত আটের বালক তখন মুণ্ডমালিনীতলায় অবধূতকে দেখেছেন বলে দাবি করেন। তাঁর কথামতো অবধূতের ভৈরবীদেবী ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী কিন্তু দেহে ছিলেন স্থূলা। বন্যার সময় দেশবাসীর দুর্দশা দেখে অবধূত লঙ্গরখানা খুলেছিলেন বলে স্মরণ করতে পারেন।

অতীতে মূল মন্দিরে অবধূত প্রতিষ্ঠিত মাতৃমূর্তি ত্রয় ছিলেন মৃন্ময়ী। সারা বছরই তাঁরা ওই দেহে অবস্থান করতেন। পরে সদানন্দ গিরি মহারাজ মাতৃমূর্তি ত্রয়কে প্রস্তরময়ী করে তোলেন। মহেশপুর গ্রাম নিবাসী বন্দোপাধ্যায় বংশের উদয়, তাপস, মন্টু, দিলীপ প্রমুখেরা নিত্য সেবার দায়িত্ব পালন করেন। নিত্য-ভোগে মাছ কিংবা মাংস আবশ্যিক নয়। প্রধান পুজো কার্তিকী অমাবস্যায়। তখন পার্শ্ববর্তী গ্রাম গুলি থেকে চাঁদা তুলে বিরাট মহোৎসবের আয়োজন করা হয়। মার নামে ছ'বিঘে জমি থাকলেও নিত্য সেবা ও সেবাইতের খরচখরচাদি মিটিয়ে মহোৎসবে মোটমুটি তিন বিঘের মতো জমি আয় পাওয়া যায়।

১৪। রামশম্ভুবাবুর ডায়েরি। তিনি বিভিন্ন সময়ে ডায়েরির চার জায়গায় অবধূত প্রসঙ্গে নানা কথা লিখে গেছেন। শেষের লেখাটি ১৪.৪.৭৮ তারিখে যখন লেখেন তখন অবধূত আর ইহ জগতে নেই। 'অবধূতের মহাপ্রয়াণ গতকল্য ১৩.০৪.৭৪ তারিখে ১৩৮৪ এর ৩০শে চৈত্র বৃহস্পতিবার বৈকাল তিনটা ত্রিশ মিঃ সময় চুঁচুড়ার জোড়াঘাটে তাঁর রুদ্রচণ্ডী আশ্রমে পরলোক গমন করেন। (যুগান্তর বার্তা)। আনন্দবাজারের ছেপেছে চুঁচুড়া হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।...জন্মস্থান ভবানীপুর।... তিনি একবার ভৈরবীমাকে সঙ্গে নিয়ে মহেশপুর মুণ্ডমালিনীতলায় প্রয় চার বৎসর বাস করেছেন। সেই সময় আমি তাঁর সঙ্গে প্রায় প্রতিদিন সাক্ষাৎ করতাম। এক কৃষ্ণা চতুর্দশী রাত্রে তাঁর বুকের নিকট ধূনির পার্শ্বে আসন করে সারা রাত্রি জপ করেছি। ওখান তাঁর সঙ্গে আমার প্রাণের হৃদ্যতা জন্মেছিল।... হিংলাজ প্রসিদ্ধ হওয়ার পর তিনবার আমার কীর্ণাহার বাটিতে এসেছিলেন। প্রথমবার এসে উদ্ধারণপুরের ঘাট নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থখানির শেষ অধ্যায় এখানে আমার বাড়ির লাগোয়া শ্রীযুক্ত শ্রীদামচন্দ্র মণ্ডলের মাটির ঘরের উপরে বসে লেখেন ও উক্ত গ্রন্থের রচনা শেষ করেন। ...আমি তন্ত্রধারক ও তিনি পূজক ছিলেন। ...সে রাত্রে বাউল সম্রাট পূর্ণদাসের বাউল গান হয়েছিল। চুঁচুড়ার বাড়িতে তিনি ভীষণভাবে মদ্য সাধনা করতেন। ...শেষের দিকে শিষ্য-শিষ্য অনেকগুলো ব্যক্তি মন্ত্র নিয়েছিল তাঁর কাছে।[১৯] ...অবশেষে ১৯১০ থেকে ১৯৭৮ এই আটষট্টি বছরের দেহ খানিকে ত্যাগ করে তিনি জগন্মাতার চরণে লীন হলেন... অবধূত একাম্নী বইটি আমার নামে উৎসর্গ করেছেন।' আবার দেখা যায় রামশম্ভুবাবুর লেখা রূপান্তর বইটির দীর্ঘ ভূমিকা লিখে দিয়েছেন অবধূত স্বয়ং। কাজেই তাঁদের মধ্যে একটা গভীর বন্ধুত্ব ছিল, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

১৫। জজান নিবাসী জমিদার পরিবারের সন্তান একাত্তর বছর বয়স্ক লক্ষ্মীজনার্দন ঘোষ মনে করতে পারেন তিনি যখন আট ন'বছরের বালক ছিলেন তখন অবধূত ও ভৈরবীমাকে জজানে থাকতে দেখেছিলেন। তার পরের বিবরণ ক্রমশ বড়ো হলে লোক মুখে শুনতে পান।

মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহাকুমা শহরের নিকটবর্তী মোটামুটি আট কিলোমিটারের মধ্যেই পড়ে জজান নামে একটি প্রাচীন গ্রাম। কান্দি থেকে ভ্যান রিক্স করে সেখানে যাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন বৌদ্ধযুগের জয়যান থেকে এসেছে জজান। গ্রামে ঢুকতেই পড়ে একটি দিঘি। তার পাড়ে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত মিলনী গ্রামীণ গ্রন্থাগারে ছোট্ট একটি পাকা ঘর। অবধূত ও তাঁর ভৈরবী ওই জায়গাটিতেই কুঁড়ে ঘর তৈরি করতে থাকেন।

গ্রামের শেষ প্রান্তে বড়ো একটি পুকুর পড়ে রয়েছে প্রাচীন সোমেশ্বর শিব ও সর্বমঙ্গলা মন্দির। তা-ছাড়া রয়েছে বড়ো নাট মন্দির, ষষ্টীতলা ও গ্রামদেবীর থান। সোমেশ্বর মন্দিরটিই প্রাচীন এবং টেরাকোটা সজ্জিত। প্রায় সাড়ে তিন ফুট উচ্চতা ভিত্তিবিশিষ্ট পূর্বমুখী অষ্টভূজ (বাইরে বহু প্রায় ১০ ফুট, গর্ভগৃহের বাহু ৪ ফুট দেওয়ালের বেধ প্রায় ৬ ফুট) মন্দিরটি উচ্চতা আনুমানিক পঞ্চাশ ফুট। ভেতরে রয়েছেন সোমেশ্বর শিবলিঙ্গ। বাইরের দেওয়ালে নষ্টপ্রায় টেরাকোটা রয়েছে কিন্তু কোনও প্রতিষ্ঠালিপি নেই। টেরাকোটা চিত্রগুলির মধ্যে রয়েছে সওয়ারি সহ উট, হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি। দেব মূর্তির মধ্যে নরসিংহ, কৃষ্ণ, বিষ্ণু প্রমুখ।

গ্রামের সর্বমঙ্গলার জায়গাটিতে অতীতে কোনও পাথরের মন্দির ছিল। লুপ্ত মন্দিরের পাথরের বেশ কিছু অংশবিশেষ ও ভগ্ন দেব-দেবী মূর্তি বর্তমান মন্দিরের গর্ভগৃহেও প্রাঙ্গণে ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এখনও। বলা বাহুল্য পাথরের মন্দির সুদূর অতীতেই ধ্বংস হয়ে যায়। গ্রামবাসীরা মাটির মন্দির তৈরি করে। দেবীর ডান দিকে একটি প্রস্তরময় ফলক। তাতে সহস্র শিব লিঙ্গের প্রতীক। বামদিকে কৃষ্ণ প্রস্তরের প্রাচীন হর-গৌরী মূর্তি, উচ্চতা প্রায় তিন ফুট। হর উর্ধ্বলিঙ্গ। বৌদ্ধ প্রভাযুক্ত ও তান্ত্রিক মূর্তিটির পুজো করতেন অবধূত। পাশের ঘরেও প্রচুর ভগ্ন মূর্তি। বলা বাহুল্য মূর্তিগুলির ভগ্নদশা কারণ অনেকের মতেই কালাপাহাড়। মন্দির প্রাঙ্গণে বৈশাখ ও চৈত্র মাসে উৎসব হয়।

এরকমের ঊর্ধ্বলিঙ্গ পশুপতি মূর্তি মহেঞ্জোদরো হরপ্পাতেও পাওয়া গেছিল। শিল্প শৈলীর বিচারে জজানের ক্ষয়ে যাওয়া হরগৌরী

মূর্তিটি পাল - পূর্ব যুগের। উড়িষ্যার খিচিং সংগ্রহশালার প্রবেশ-পরে ডানদিকের ঘরে চারটি এরকমের হরপার্বতী মূর্তি আছে। সবগুলিই জজানের মতো উত্তেজিত — মিথুন ভাস্কর্য। কলিঙ্গ রীতিকে অস্বীকার করে খিচিং শিল্পী নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে শিবের লিঙ্গটি উৎকীর্ণ করেছেন ঠিকই কিন্তু পার্বতীকে ব্যতিক্রমী রেখেছেন। অন্যদিকে অর্ধনারীশ্বর মূর্তিটির বেলায় পুরুষ ও নারী অংশে সমভাবে যৌনাঙ্গ উৎকীর্ণ করে দূঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন। খিচিং থেকে পাওয়া একটি হরপার্বতীর মূর্তি ছাপা রয়েছে জিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির দা ডেভেলপমেন্ট অফ হিন্দু আইকোনোগ্রাফী বই-এ তা-ছাড়া ভারতীয় ভাস্কর্যে মিথুন নামক বই-য়ে নারায়ণ সান্যাল খিচিং মিউজিয়ামের রাখা হর-পার্বতী ও অর্ধনারীশ্বর মূর্তির স্কেচ ও বর্ণনা দিয়েছেন।

সোমেশ্বর মন্দিরের পাশে রয়েছে পাতাল ঘর। মাথায় টিনের ছাউনি। পর পর সিঁড়ি নেমে গেছে গভীর অন্ধকারে। সাহস করে নিচে নামা যায়নি। লক্ষ্মীজনার্দন বাবুর কথা অনুসারে জানা যায়— সোমেশ্বর মন্দিরের সময়ই এই পাতাল ঘর তৈরি হয়েছিল। অবধূত দম্পতি জজানে প্রথম পদার্পণের সময় থেকে ওখানে থাকতেন। ওরকমের পাতাল ঘর নদিয়ার অন্যতম সতীপীঠ কালীগঞ্জ থানার জুড়ানপুরে আছে। (এ প্রসঙ্গে লেখদ্বয়ে সতীপীঠ ঃ উদ্ভব ক্রমবিকাশ ও বর্ধমান বইটি দেখা যেতে পারে।)

১৬। সূচনা মুখোপাধ্যায় ঃ পুত্রবধূর চোখে শ্বশুর অবধূত - মনে পড়ে ঃ জাগরণ, উৎসব সংখ্যা ১৪০৯ পৃ ৮

১৭। ডাঃ অক্ষয় কুমার আঢ্য ঃ যেমন তাঁকে দেখেছি - প্রতিবেশী অবদূত ঃ জাগরণ, উৎসব সংখ্যা ১৪০৯ পৃ ৯

১৮। চুঁচুড়োর বানিতে (দ্রাঘিমাংশ ৮৮ ডিগ্রি ২৪ মিনিট ১৬.২ সেকেন্ড পূর্ব এবং ২২ ডি ৫৩ মি ৩৮.২ সে উত্তর অক্ষাংশ) অবধূতের পৌত্র তারাশঙ্কর এক সাক্ষাৎকারে বলেন— অবধূত ১৯৫১ -৫২ খ্রিস্টাব্দে চুঁচুড়োর জায়গা খরিদ করেন। সে রকমের দলিল - পারচাও নাকি তাঁদের হেফাজতে আছে। সেগুলি অবশ্য পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব হয়নি। ওদিকে কীর্ণাহারের প্রধান শিক্ষক রামশম্ভুবাবুর বক্তব্য কিন্তু অন্যরকম যা মূল প্রবন্ধে লেখা আছে।

১৯। এপ্রিল ২০০৯ থেকে বহুল প্রচারিত মাসিক প্রসাদ পত্রিকায় সুলেখক ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের একটি ধারাবাহিক উপন্যাস প্রকাশিত হচ্ছে। সেখানে দাবি করা হয়েছে অবধূতের সাক্ষাৎ শিষ্য লেখক ষষ্ঠীবাবু তাঁর গুরুর সঙ্গে সুদীর্ঘকাল কাটিয়েছেন এবং তাঁর জীবনের ননা ঘটনার তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী। অবধূতের চুঁচুড়োর বাড়িতেও তাঁর ছিল অবাধ গতিবিধি। পত্রিকায় প্রকাশিত উপন্যাসের প্রস্তাবনা ও মুদ্রিত ছবি দেখে সে-ধারণা আরও বদ্ধমূল হওয়াটাই স্বাভাবিক। এসব কারণে অনেক পাঠক তাঁর লেখা ধারাবাহিক উপন্যাসটিকে ঝাড়াই - বাছাই করে নিয়ে অবধূতের ও তাঁর গুরুর জীবন-কথা বলে মনে করতে পারেন। সেখান থেকেই অবধূতের অজ্ঞাত - বাসের জীবন-কথার রসদ আহরণ করতে আগ্রহীও হতে পারেন। যেহেতু অবধূতের কোনও জীবন-কথা নেই সেকারণে সেরকমের একটা দুরাশা আমাদেরও একসময় ছিল। কিন্তু দুঃখের কথা তথাকথিত উপন্যাসটিতে যে ঘটনাগুলির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সেগুলি এতটাই অবাস্তব এবং রুচিবহির্ভূত যেকোনও যুক্তিবাদী পাঠক কোনও মতেই সেগুলির অংশ মাত্রকেও অবধূত বা তাঁর গুরুর জীবন কথা বলে মেনে নিতে পারবেন না। অন্তত আমাদের ধারণা সেরমেরই। কিন্তু যদি কেউ সেটিকেই সত্য বলে মনে করেন তা-হলে সেটা হবে অবধূত এবং তাঁর শ্রদ্ধেয় গুরুর প্রতি অবমাননা ও অবিচার।

২০। অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় (কুন্তি) সাক্ষাৎকার ঃ জাগরণ ১৪১০। সাবিত্রী দেবী বলেন— অবধূতের লেখা মরুতীর্থ হিংলাজ উপন্যাসটি আমার আগেই পড়া ছিল। পড়বার সময়ই মনে হয়েছিল, কাহিনীটি নিয়ে কেউ যদি কোনও দিন বাংলা ছবি তৈরি করেন তাহলে কুন্তির ভূমিকাটি যেন আমি পাই...কুন্তির চরিত্র আমার কাছে এক ড্রিমরোল—স্বপ্নের অভিনয়। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের মতানুসারে— মরুতীর্থ হিংলাজ বাংলা ছবির ইতিহাসে পুরোপুরি মরুঝড়। ...বক্স অফিস কাঁপানো হিট...। ছবিটির পরিচালক ছিলেন বিকাশ রায়। থিরুমল চরিত্রে উত্তম কুমার। উত্তমকুমার তাঁর আত্মজীবনীতে অবধূতের ভালোবাসার কথা উল্লেখ করেছেন।

২১। সাহিত্যিক সুশীল জানার পুত্র ড. রঞ্জন কান্তি জানার মৌখিক বিবৃতি। অবধূতের লেখা পুস্তকের রয়্যালটি আনতে যাওয়ার একটি চিত্রের কথা সুশীল জানা প্রায়শ বলতেন বলে শোনা যায়— সব্জিবাজারের ব্যাগে তিনি টাকাগুলি রেখে রাতের ট্রেনে কোলকাতা থেকে চুঁচুড়ো আসতেন। সম্ভবত পকেটমারের ভয়ে।

২২। শঙ্কু মহারাজ ঃ সেই লিস্টের উপর দিকেই ছিলেন অবধূত ঃ জাগরণ ১৪১০

পরিশিষ্ট-১ ঃ বংশতালিকা ঃ রামরাম মুখোপাধ্যায়ের পুত্র গোপাল, তৎপুত্র অনাথনাথ। অনাথনাথ ও প্রভাবতী দেবীর দুই পুত্র দুলাল ও মৃণাল। কন্যা চার - লক্ষ্মীমণি, সরস্বতী, অণুকণা ও তুলিকণা! দুলালের (অবধূতের) দুই স্ত্রী সরোজিনী ও সুখময়ী। সরোজিনী নিঃসন্তান। সুখময়ীর পুত্র অমল। অমল ও সূচনার দুই পুত্র তারাশঙ্কর ও সংকর্ষণ। পুত্রবধূদ্বয় যথাক্রমে বর্ণালী ও শর্মিষ্ঠা। তারাশঙ্কর ও বর্ণালীর পুত্র অন্বেষণ।

দুলালের ভাই মৃণাল ও ধীরার সন্তান-সন্ততিরা হলেন— তপন, তুষার, মঞ্জু, আলপনা, রুবি ও বিপাশা।

পরিশিষ্ট ২ ঃ গ্রন্থ - তালিকা ঃ তুলিকলম থেকে

১। মরুতীর্থ হিংলাজ ঃ জুলাই ১৯৫৪

২। অনাহুল আহুতি ঃ প্রথম মুদ্রণ ১৯৬০ (?) দ্বিতীয় মুদ্রণ শ্রাবণ ১৯৭৩

৩। একটি মেয়ের আত্মকাহিনী ঃ ১৯৬০

৪। উদ্ধারণপুরের ঘাট

৫। বিশ্বাসের বিশ

৬। আমার চোখে দেখা ঃ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২, জুন ১৯৭৫
৭। কলিতীর্থ কালীঘাট
৮। স্বামীঘাতিনী ১৯৬০
৯। পথে যেতে যেতে ঃ মার্চ ১৯৭৬, ফাল্গুন ১৩৮২
১০। ভোরের গোধূলি ঃ ১৩৭৬, আগস্ট ১৯৭৫ অন্যান্য প্রকাশনা থেকে
১১। মিড় গমক মূর্চ্ছনা ঃ অ্যাসোশিয়েটেড পাবলিসার্শ ১৩৬৫
১২। দেবারিগণ ঃ গুপ্ত প্রকাশিকা ঃ ১৩৬৬
১৩। সাধনা
১৪। বশীকরণ ঃ ১৯৬০
১৫। নীলকণ্ঠ হিমালয় ঃ ফাল্গুন ১৩৭২
১৬। তুমি ভুল করেছিলে ১৯৬০
১৭। তাহার দুই তারা ১৯৫৯, মিত্র গোষ ১৩৬৬
১৮। ভুমিকালিপি পূর্ববৎ ১৬০
১৯। কান পেতে রই ১৯৬০
২০। ফক্কর তন্ত্রম ঃ ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড ১৯৬০
২১। দুর্গম পন্থা ১৬০
২২। মন মানে না ১৬০
২৩। সাচ্চা দরবার ১৬৯০
২৪। উত্তর রামচরিত ঃ দেবশ্রী সাহিত্য সমিতি ১৯৬০
২৫। সুমেরু কুমেরু ঃ জ্যোতি প্রকাশন, ১৯৭৯
২৬। পিয়ারী ঃ ১৯৬১
২৭। বহুব্রীহি ঃ মিত্র ঘোষ, ১৩৭৬
২৮। টপ্পা ঠুংরি ১৩৭৬
২৯। একা জেগে থাকি
৩০। হিংলাজের পরে ঃ মিত্র ঘোষ, ১৯৬৯
৩১। শুভায় ভবতু ঃ মিত্র ঘোষ ১৯৬৪
৩২। দুরি বৌদি ঃ মিত্রালয়, মাঘ ১৩৫৬
৩৩। মায়া মাধুরী (গল্প সংকলন) ১৩৬৭
৩৪। ক্রিম (গল্পসংকলন)
৩৫। নিরাকারের নিয়তি ঃ ন্যাশনাল পাবিলিশার্স, ১৩৭০
৩৬। যা নয় তাই
৩৭। সীমন্তিনী সীমা
৩৮। একাঘ্নী
৩৯। দুই তারা ঃ মিত্র ঘোষ, চৈত্র ১৩৬৫
৪০। অবধূত ভ্রমণ অমনিবাস (সংকলন)

অসামাপ্ত পাণ্ডুলিপি—
১। সুরাতীর্থ তারাপীঠ
২। বিবিবলির বিল
একমাত্র কবিতা - আকাশ দৃষ্টি

পরিশিষ্ট ৩ঃ উৎসর্গপত্র
১। উদ্ধারণপুরের ঘাট - পুজ্যপদ পিতৃদেব অনাথনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীচরণোদ্দেশে।
২। কলিতীর্থ কালীঘাট ঃ প্রভাবতীদেবীর শ্রীশ্রী চরণ কমলে।
৩। বশীকরণ ঃ অমলের মা সুখময়ীদেবীকে।
৪। হিংলাজের পরে ঃ পরম সুহৃদ শ্রীপ্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের করকমলে।
৫। দুর্গমপন্থা ঃ পরম কল্যাণীয় শ্রীমান মন্তু ও পরম প্রিয় শ্রীমান ভানু, আমার দুর্গাপন্থার সাথী দুজনকে।
৬। নীলকণ্ঠ হিমালয় ঃ শ্রী দেবব্রত ধর সুহৃদ বরেষু।
৭। দুই তারা ঃ নিম্বাকাচার্য ব্রজবিদেহী শ্রীশ্রী ১০৮ শ্রীঁ সন্তদাস বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত পরম বৈষ্ণব বন্ধুবৎসল রূপমঞ্জ সম্পাদক শ্রীকালীশকে।
৮। দুরি বৌদি ঃ
সাহিত্যে রচিরেহচিদার বিরচিতে যস্যেহ শুভ্রাং যশো— যো বিদ্বান বহুদর্শকঃ সুরসিকঃ সাক্ষাৎ স্ব এবাস্মিমে। আলিঃ সৈয়দিতি প্রকৃত্য বিদিতো ডক্টর চ যো মুজতবা, তস্মৈ মুর্শিদিতি প্রিয়ায় রচনং দত্তেহবধুতোহধুনা।
৯। একাঘ্নী ঃ রামশম্ভু গঙ্গোপাধ্যায়।